সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জানুয়ারি ২০২১

সবার আগে ভারতের ভ্যাকসিন পেল বাংলাদেশ

ভারতের ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

২৬ জানুয়ারি ২০২১ ভারতের ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উপস্থিত ভারতীয় সামনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী রামনাথ কোবিন্দ-এর বাণী পাঠ করে শোনান হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী

পদ্মশ্রী ২০২১ খেতাবে ভূষিত হওয়ায় দুই বাঙালিকে অভিনন্দন!!!

জনপ্রশাসন ও শিল্পক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকারের পদ্মশ্রী ২০২১ খেতাবে ভূষিত লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতীক ড. সনজীদা খাতুনকেকে ভারতীয় হাই কমিশনের অভিনন্দন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৪৯ | সংখ্যা ০১ | পৌষ-মাঘ ১৪২৭ | জানুয়ারি ২০২১

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

সবার আগে ভারতের ভ্যাকসিন পেল বাংলাদেশ
পৃষ্ঠা ০৪

সূচিপত্র

সৌহার্দ সবার আগে ভারতের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন উপহার পেল বাংলাদেশ ০৪
প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ২০২১ বাংলাদেশ তিনবাহিনি মার্চিং কন্টিনজেন্ট এবং আনুষ্ঠানিক ব্যান্ডের অংশগ্রহণ ॥ নেতাজী জন্মজয়ন্তীতে সিরডাপে আন্তর্জাতিক সেমিনার ০৬ ॥ বিদ্যুৎ সহযোগিতা সংক্রান্ত ১৯তম জেএসসি বৈঠক ॥ বিমসটেক মহাসচিবের সঙ্গে হাই কমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ রবি আজিয়াটার কার্যক্রম উদ্বোধন ০৭ ॥ ভারতীয় ঋণচুক্তির আওতায় উচ্চস্তরের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রথম সভা ॥ প্রারম্ভ স্টার্টআপ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রী ০৮ ॥ মুক্তিযোদ্ধা উত্তরপ্রজন্মের বৃত্তিপ্রাপ্ত ও তাদের পরিবারবর্গকে সংবর্ধনাজ্ঞাপন ॥ আমার কাছে স্বাধীনতা মানে কী? শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা ০৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি দেশপ্রেমে দেদীপ্যমান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১০
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫

ইতিহাস ঝিকরগাছায় মুছে যাচ্ছে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের স্মৃতিচিহ্নগুলো ॥ ডা. সুব্রত ঘোষ ১১
মাস্টারদা সূর্য সেন ৩৬

উন্নয়ন জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ সংহতি ১৩

সংস্কৃতি যাত্রাপালার একাল ও সেকাল ॥ অরবিন্দ মণ্ডল ১৭

প্রবন্ধ মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক প্রহেলিকার নাম ২০

কবিতা আলী ইব্রাহিম ২৪ ॥ শাহীন রেজা ॥ দিলীপ কির্ত্তুনিয়া
রওশন রুবী ॥ এস এম তিতুমীর ২৫

চলচিত্র স্মরণীয় অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন ২৬

ব্যক্তিত্ব পার্থপ্রতিম মজুমদার: বিশ্ববন্দিত মূকাভিনেতা ২৯

ঐতিহ্য ঢাকাই মসলিনের পুনর্জন্ম ৩০

শিশুতীর্থ ক্ষীরের পুতুল ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮

ধারাবাহিক কেউ কেউ পায় ॥ অনিন্দিতা গোস্বামী ৪১

হেঁসেলঘর হিমাচল প্রদেশের খাবার-দাবার ৪৬

শেষ পাতা মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪৮

সম্পাদক
নান্টু রায়
ফোন: ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: inf4.dhaka@mea.gov.in
প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ • গ্রাফিক্স শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই। এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ
ভারত বিচিত্রা

গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ

আমরা ভারত বিচিত্রার গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করছি। যেসব গ্রাহক ভারত বিচিত্রার মুদ্রিত সংস্করণ পেতে চান, তাঁরা নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উল্লেখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখুন বা inf4.dhaka@mea.gov.in-এ ই-মেইল পাঠান। ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে, অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। – সম্পাদক

গ্রাহক ও লেখক যথাক্রমে ইংরেজিতে নিচের তথ্যসমূহ পূরণ করে চিঠি বা লেখা পাঠান:

Name :..... Pen Name :.....
Address :..... Bank Account Name :.....
..... Account No :.....
..... Bank Name :.....
Phone/Mobile :..... Routing No :.....
e-mail :.....

চিঠিপত্র

মুদ্রিত সংস্করণ পেতে চাই

আমি আপনার সম্পাদিত ভারত বিচিত্রার মুদ্রিত সংস্করণ পেতে চাই। তাই আমাকে ভারত বিচিত্রার মুদ্রিত সংস্করণের একজন গ্রাহক হিসেবে মনোনীত করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

খোরশেদ আলম
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ- ফাইনেন্স
এলিন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড
ভূঁইয়া সেন্টার ২য় তলা, ৬৮, দিলকুশা বা/এ
মতিঝিল, ঢাকা -১০০০

আত্মার খোরাক

আমি একজন লেখক। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স মাস্টার্স শেষ করে প্রভাষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। বর্তমানে সাংবাদিক। ২০১৭ ও ২০১৯ সালে আমার দুটি কাব্যগ্রন্থ এবং ২০২০ সালে প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গল্পগ্রন্থটি 'পাণ্ডুলিপি পুরস্কার ২০২০' বিজয়ী।

উল্লেখ্য, *ভারত বিচিত্রায়* আমার কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল এবং আমি স্টেট ব্যাংকের চেক মারফত সম্মানীও পেয়েছিলাম।

কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়মিত ও জেলা গণগ্রন্থাগারে অনিয়মিতভাবে ভারত বিচিত্রা পড়ি। সব সংখ্যা পাই না। তবে যা পাই গোগ্রাসে গিলি। পত্রিকাটি আমাকে যেভাবে মননে, সৃজনশীলতায় সমৃদ্ধ করছে, আমি চাই সেই জ্ঞানপ্রদীপ ছড়িয়ে পড়ুক অন্যদের মাঝেও। তাই আমার আত্মার খোরাক ভারত বিচিত্রা নিয়মিত পেতে চাই। সে প্রত্যাশায় আমার পূর্ণ ঠিকানা নিম্নরূপ:

তন্ময় আলমগীর
সাংবাদিক ও সাহিত্যিক
গ্রাম: নামাপাড়া, পোস্ট: জঙ্গলবাড়ি
থানা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ

বহুল প্রচারিত এবং ভীষণ প্রিয়

আমি আপনার বহুল প্রচারিত এবং আমার ভীষণ প্রিয় ভারত বিচিত্রার নিয়মিত গ্রাহক হতে চাই এবং নিয়মিত পত্রিকাটি হাতে পেতে চাই। এই বিষয়ে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য। গ্রাহক ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ করে এই বার্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলাম।

আহমেদ চঞ্চল
৪৭/৬ পশ্চিম শ্যাওড়াপাড়া
মীরপুর, ঢাকা-১২১৬

তথ্যবহুল ও শিক্ষামূলক

আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনির একজন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপটেন। বর্তমানে ঢাকার মিরপুর ডিওএইচএস-এ বসবাসরত। আমি ভারতের ব্যাপারে অতিশয় উৎসাহী। আমি পরিবার-পরিজন নিয়ে গত কয়েকবছরে অনেকবার ভারত ভ্রমণ করেছি। আমি দিল্লি, কাশ্মীর, কলকাতা, মানালি, কুলু, মেঘালয়, দার্জিলিঙ, চেন্নাই, বুদ্ধগয়া ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেছি। আগামী দিনগুলোতে পরিবার-পরিজন নিয়ে আরও বহু পর্যটনস্থল ভ্রমণের আশা রাখি। ভারত এক মিনি বিশ্ব। এখানে দেখার এক জিনিস আছে যে, দেখে শেষ হয় না।

শিশুকাল থেকেই আমি আপনাদের তথ্যবহুল ও শিক্ষামূলক মাসিক পত্রিকা ভারতে বিচিত্রা পড়ে আসছি। কিন্তু পেশাগত বদলির চাকরি ও বার বার বাসস্থান পরিবর্তনের সুবাদে আমার পক্ষে নিয়মিত ভারত বিচিত্রা সংগ্রহ ও পাঠ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখন আমি মিরপুর ডিওএইচএস-এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করছি। ফলে এখন ভারত বিচিত্রা নিয়মিত পাবার ও পড়ার বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাকে নিয়মিত পত্রিকাটি পাঠালে ভারত সম্পর্কে জানার পরিধি বিস্তৃত হবে। বিশেষ উপকৃত হব।

ক্যাপটেন এ বি চৌধুরী বিএন (অব.)
বাড়ি নং ৪৬৪, সড়ক নং ৬, এভেনিউ নং ৬
মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬

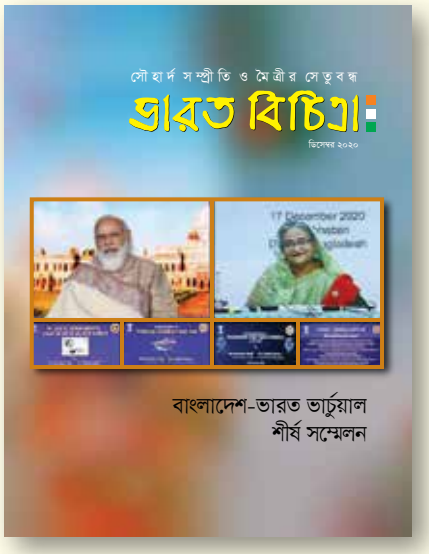

পাঠাগারে একান্ত আবশ্যক

উপরিউক্ত বিষয়ে আপনাকে বিনয়ের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া শেরেবাংলা সাধারণ পাঠাগার ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ পাঠাগারে ভারত বিচিত্রা প্রেরণ করা হয় না। এখানে প্রতিদিন গড়ে পনের-কুড়িজন মানুষ পড়তে আসেন।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক এবং আমাদের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র ভারতের জনগণের জীবনযাত্রা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্যে এ পাঠাগারে ভারত বিচিত্রা একান্ত আবশ্যক। এমতাবস্থায় দক্ষিণবঙ্গের বরিশালের শেরেবাংলা সাধারণ পাঠাগার, মঠবাড়িয়াকে গ্রাহক তালিকাভুক্ত করার জন্যে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

নূর হোসাইন মোল্লা সম্পাদক
শেরেবাংলা সাধারণ পাঠাগার
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর

লাইটস... ক্যামেরা... মুজিববর্ষে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় *বঙ্গবন্ধু* বায়োপিক

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম আমাদের পৃথিবীকে বদলে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন সেই বিরল প্রতিভা যিনি সময়কে পরিবর্তন করার সাহস করেছিলেন। এটি করতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে বাংলাদেশকে সৃষ্টি করেছিলেন। মুজিববর্ষ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় *বঙ্গবন্ধু* নামাঙ্কিত একটি বায়োপিক নির্মিত হতে যাচ্ছে, যার পরিচালনা করছেন ভারতের বিশিষ্ট পরিচালক শ্যাম বেনেগাল।

১৪ জানুয়ারি ২০২১ ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় বঙ্গবন্ধু বায়োপিকের শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মানে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করে। এ তারকাসমৃদ্ধ রাতে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। ইতিহাসকে জীবিত করে তুলতে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীরা আশানুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন

২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভারত সরকার বাংলাদেশকে ভারতে উৎপাদিত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কোভিশিল্ডের ২০ লাখ ডোজ উপহার হিসেবে প্রদান করেছে। ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী এই ভ্যাকসিনগুলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যকার ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার ধারাবাহিকতায় ভারতে ভ্যাকসিন প্রদান শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ভারত বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছে। এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন বাংলাদেশকে সেই কোভিশিল্ডের উপহারকে কেন্দ্র করেই।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের প্রাণসত্তা– নির্ভীক, অতুলনীয় দেশপ্রেমে দেদীপ্যমান। সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির অজস্র মিথ্যা প্রচারণা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে কখনও মসীলিপ্ত করতে পারেনি। ইংরেজি ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি উড়িষ্যার কটকে তাঁর জন্ম হয়। কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অসম্ভব মেধাবী সুভাষচন্দ্র নানা ঘটনাপ্রবাহে দেশের পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে পিতার ইচ্ছায় চলে গেলেন ইংল্যান্ডে সিভিল সার্ভিস পড়তে– বসলেন আইসিএস-এ। দেখা গেল সুভাষ চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। দেশে ফিরে উচ্চ বেতনের সরকারি চাকরির প্রলোভন ত্যাগ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কংগ্রেসে যোগ দিলেন, গান্ধীজির সঙ্গে মতানৈকে সভাপতির পদও ছাড়লেন। বুঝতে পারলেন, আবেদন-নিবেদনে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। যোগ দিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধ শিবিরে। গঠন করলেন আজাদ হিন্দ সরকার। কিন্তু জাপান ও জার্মানির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয় তাঁকে হতোদ্যম করে ফেলে। এরই মধ্যে ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট জাপানে তাইহাকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি নিহত হয়েছেন বলে খবর আসে। যদিও দেশবাসী তা বিশ্বাস করেননি। দেশপ্রেমিক, অক্ষয়ী বীর বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (এ) ধারা রদের ফলে রাজনৈতিকভাবেই শুধু নয়, জম্মু-কাশ্মীরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণও সম্ভব হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ– দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করার আগে শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন, শিক্ষার অধিকার, ভূমি অধিগ্রহণ আইন, বহু প্রতিবন্ধকতা আইন, প্রবীণ নাগরিক আইন, পুনর্গঠন আইন, সত্যসন্ধানীদের সুরক্ষা আইন, উপজাতিদের ক্ষমতায়ন আইন, জাতীয় নাবালক কমিশন, জাতীয় শিক্ষা শিক্ষণ পরিষদের মত বিভিন্ন আইন সেখানে প্রযোজ্য ছিল না; ৩৭০ ধারা বাতিলের পর বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এর হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে সমৃদ্ধি আসছে। জম্মু-কাশ্মীরের সাম্প্রতিক উন্নয়ন নিয়ে আছে একাধিক নিবন্ধ।

শীতের রিক্ততা এখনও প্রকৃতিতে লাগেনি। চারিদিক নিঃসীম শূন্যতা আর কুয়াশার চাদরে মোড়া। জবুথবু... তবু তারই মধ্যে সুয্যিমামা নতুন দিনের আগমনী বার্তা নিয়ে এল। প্রথমদিনের সেই সূর্যের আগমনী আমাদের সবার জীবনে পুষ্প-পল্লবের সজীবতা নিয়ে আসুক, এই প্রত্যাশা।
স্বাগত ইংরেজি নতুন বছর ২০২১।

সৌহার্দ

সবার আগে ভারতের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন উপহার পেল বাংলাদেশ

২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভারত সরকার বাংলাদেশকে ভারতে উৎপাদিত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কোভিশিল্ডের ২০ লাখ ডোজ উপহার হিসেবে প্রদান করেছে। ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী এই ভ্যাকসিনগুলো পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেকের কাছে হস্তান্তর করেন। এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে ভ্যাকসিনগুলো যথাযথ নিয়মানুসারে বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়ার পরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যকার ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার ধারাবাহিকতায় ভারতে ভ্যাকসিন প্রদান শুরু হওয়ার (১৬ জানুয়ারি ২০২১ শুরু হয়েছিল) এক সপ্তাহের মধ্যে ভারত বাংলাদেশকে ভ্যাকসিন সরবরাহ করেছে।

তিনি বলেন, প্রতিবেশী প্রথমে নীতির অংশ হিসেবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রতি ভারত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। তিনি আরও বলেন যে, কোভিশিল্ডের ২০ লাখ ডোজ উপহার আসলে ভারতের দ্বারা প্রতিবেশী কোনও দেশকে দেওয়া সবচেয়ে বড় পরিমাণ। কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের (অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন) চালানটি ভারতের পুনেতে অবস্থিত সেরাম ইনস্টিটিউট উৎপাদন করেছে এবং উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তার নিজস্ব কোটা থেকে কিনেছে।

হাই কমিশনার বলেন, ২১ জানুয়ারি একটি যুগান্তকারী দিন– বাংলাদেশে প্রথমবারের মত কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে এই ভ্যাকসিনগুলো। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অংশীদার হিসেবে ভারত এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে অবদান রাখতে পেরে আনন্দিত। একসাথে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় দুই দেশ কর্তৃক ইতোমধ্যে নেওয়া অনেক পদক্ষেপের মধ্যে ভ্যাকসিন উপহার সর্বশেষ উদ্যোগ। ২০২০ সালের ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সার্ক নেতাদের একটি ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের সম্মিলিত ক্ষমতা, দক্ষতা এবং সংস্থান ব্যবহারের মাধ্যমে সহযোগিতার আহ্বান জানান। এর পরপরই সার্ক কোভিড-১৯ জরুরি তহবিল গঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে আগত স্বাস্থ্যসেবাদানকারী, প্রশাসক ইত্যাদি পেশাজীবীরা ভারতের শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল ইনস্টিটিউট, যেমন– অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এআইএমএস) দ্বারা পরিচালিত অনলাইন সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণগুলিতে অংশ নেয়। হাই কমিশনার বলেন, বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আসা স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের জন্য এআইএমএস, ভুবনেশ্বরে বাংলা ভাষায় আয়োজিত কোভিড-১৯ সংক্রান্ত কোর্সটি ছিল এক দুর্দান্ত সাফল্য। ভ্যাকসিন সরবরাহকে সহজতর করার জন্য ১৯-২০ জানুয়ারি, ২০২১ ভারত সরকার 'ট্রেইন দ্য ট্রেনার' নামে দুইদিনব্যাপী একটি অনলাইন কোর্সও পরিচালনা করেছে।

কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের এই ২০ লাখ ডোজ উপহার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এবং মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেকের কাছে হস্তান্তর করার পর হাই কমিশনার আশা প্রকাশ করেন যে, দু'দেশের এই ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মহামারীকে পরাজিত করা হবে এবং আমাদের জনগণের সুবিধার্থে অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখা হবে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO কর্তৃক অনুমোদিত অক্সফোর্ডের টিকা Covishield-এর ২০ লাখ ডোজ বাংলাদেশকে উপহার হিসেবে দেওয়ায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ২০২১

বাংলাদেশ তিনবাহিনি মার্চিং কন্টিনজেন্ট এবং আনুষ্ঠানিক ব্যান্ডের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনির ১২২জন গর্বিত সৈন্যের একটি দল বিশেষ আইএএফ সি-১৭ বিমানযোগে ভারতে যান। দলটি ২৬ জানুয়ারি ২০২১ নয়াদিল্লিতে ভারতের গণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশ নেয়।

ভারতের ইতিহাসে তৃতীয়বারের মত কোনও বিদেশী সামরিক বাহিনির দলকে মধ্য দিল্লির রাজপথে জাতীয় কুচকাওয়াজে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, ২০২১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্ণ হচ্ছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ অত্যাচার ও নিপীড়নের কবল থেকে মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

৫০ বছর আগে যে বাহিনি একসঙ্গে লড়াই করেছে, তারা গর্বের সঙ্গে দিল্লির রাজপথে মার্চ করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনি স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং তাদের জনগণের পক্ষে লড়াই করা সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনির দলটিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনির সৈনিক, বাংলাদেশ নৌবাহিনির নাবিক এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনির বিমান সেনারা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের বেশিরভাগ সৈন্যই বাংলাদেশ সেনাবাহিনির সর্বাধিক দক্ষ ইউনিট থেকে আগত, যার মধ্যে রয়েছে ১, ২, ৩, ৪, ৮, ৯, ১০ ও ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ১, ২ ও ৩ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট, যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয় অর্জনের অনন্য সম্মানে ভূষিত। এই কুচকাওয়াজ ২৬ জানুয়ারি ২০২১ বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। ● সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নেতাজী জন্মজয়ন্তীতে সিরডাপে আন্তর্জাতিক সেমিনার

২৪ জানুয়ারি ২০২১ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামীর উপস্থিতিতে 'অখণ্ড গৌরব' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

বিদ্যুৎ সহযোগিতা সংক্রান্ত ১৯তম জেএসসি বৈঠক

বিদ্যুৎ সহযোগিতা সংক্রান্ত ১৯তম জেএসসি বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে ভারতের বিদ্যুৎ সচিব এস এন সাইনি ও বাংলাদেশের বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মো. হাবিবুর রহমান

বিমসটেক মহাসচিবের সঙ্গে হাই কমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ বিমসটেকের সঙ্গে ভারতের অব্যাহত কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হাই কমিশনার শ্রী বিক্রম দোরাইস্বামী বিমসটেক মহাসচিব মি. তেনজিন লেখপেলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

রবি আজিয়াটার কার্যক্রম উদ্বোধন

হাই কমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের কর্মকর্তারা বেল বাজিয়ে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে চালু হওয়া সর্বকালের বৃহত্তম আইপিও রবি আজিয়াটার কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। হাই কমিশনার বাংলাদেশে ভারতের বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের সাফল্য কামনা করেন

ভারতীয় ঋণচুক্তির আওতায় উচ্চস্তরের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রথম সভা

ভারতীয় ঋণচুক্তির আওতায় উচ্চস্তরের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রথম ভার্চুয়াল সভায় ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন

৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত 'উচ্চস্তরের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রথম বৈঠকে' বাংলাদেশ এবং ভারত সরকার ভারতীয় ঋণচুক্তির (এলওসি) আওতায় অর্থায়িত প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে এবং এলওসি তহবিলের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ সমাধান এবং প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্য উভয়পক্ষের সম্মিলিতভাবে নেওয়া বেশ কয়েকটি উদ্যোগের মধ্যে একটি হল– উচ্চস্তরের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কমিটি। উচ্চপর্যায়ের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কমিটিতে বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং ভারতীয় এক্সিম ব্যাংকের কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত-বাংলাদেশ উন্নয়ন অংশীদারিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের ঋণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় উন্নয়ন অংশীদার। বাংলাদেশ সরকারের কাছে ঋণচুক্তির অধীনে ভারত সরকারের মোট প্রতিশ্রুতি ৭,৮৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার মধ্যে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অনুমোদিত ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে ভারত সরকারের তিনটি ঋণচুক্তির আওতাধীন ৪৬টি প্রকল্পের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে (৪১২.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ৮টি প্রকল্প চলমান (১,০১৩.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ১৫টি প্রকল্প দরপত্র পর্যায়ে (৩,১৯৫.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং ১৪টি প্রকল্প ডিপিপি (৩,০৮১.৩৪ মার্কিন ডলার) প্রস্তুতি পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পগুলির প্রায় ৮৩ শতাংশ এখনও পরিকল্পনা/ডিপিপি (প্রায় ৪১ শতাংশ) এবং দরপত্র (প্রায় ৪২ শতাংশ) পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে এ পর্যন্ত প্রায় ১,২৭৬.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যা মোট ঋণচুক্তির ১৭ শতাংশ। এ জাতীয় চুক্তির আওতায় ভারতীয় এক্সিম ব্যাংক এ পর্যন্ত ৭১৯.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চুক্তির মূল্যের ৫৬ শতাংশ) বিতরণ করেছে। প্রথম ঋণচুক্তির ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্থানীয় উপকরণ বৃদ্ধি, ক্রয় প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং ঋণচুক্তি সংশোধনীর জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। ভারতীয় ঋণচুক্তির আওতাধীন প্রকল্পগুলির সময়োপযোগী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রক্রিয়াগত বাধা পর্যালোচনা ও দূরীকরণে ১৮তম ঋণচুক্তি পর্যালোচনা সভার (২০-২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য) আগে একটি প্রযুক্তিগত পর্যালোচনার জন্য ঐকমত্য হয়েছিল।

ডিপিপি প্রস্তুতি এবং দরপত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা প্রকল্পসমূহ ত্বরান্বিত করার জন্য ফলোআপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় ঋণচুক্তির তহবিলের বাইরে চিহ্নিত প্রকল্পগুলির জন্য ডিপিপি প্রস্তুতি ত্বরান্বিতকরণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে, যাতে দ্রুত দরপত্রের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

এছাড়া, দরপত্র প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে, যা বিজয়ী দরদাতাদের চুক্তি প্রদান এবং প্রকল্পগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের গতি বৃদ্ধি করবে। বাস্তবায়নের আওতাধীন প্রকল্পগুলি কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং সময়মত অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ এবং প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যা প্রকল্পগুলির অগ্রগতিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে।

● সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রারম্ভ স্টার্টআপ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রী

১৫ জানুয়ারি ২০২১ স্টার্টআপ ইনডিয়া ও ডিআইপিপিজিওআই আয়োজিত *প্রারম্ভ* স্টার্টআপ ইন্ডিয়া আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের আইসিটি মন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভারত ও বাংলাদেশ এবং বিমসটেকভুক্ত অন্যান্য দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমগুলির মধ্যে সম্ভাব্য সমন্বয় বিষয়ে বক্তব্য রাখেন

মুক্তিযোদ্ধা উত্তরপ্রজন্মের বৃত্তিপ্রাপ্ত ও তাদের পরিবারবর্গকে সংবর্ধনাজ্ঞাপন

১৩ জানুয়ারি ২০২১ বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষে ভারতীয় হাই কমিশন মুক্তিযুদ্ধে অমিত বিক্রম প্রদর্শনকারী মুক্তিযোদ্ধা ও তরুণ মুক্তিযোদ্ধা বৃত্তিপ্রাপ্তদের সম্মানে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে মুক্তিযোদ্ধা উত্তরপ্রজন্মের বৃত্তিপ্রাপ্ত ও তাদের পরিবারবর্গ অংশগ্রহণ করেন

‘আমার কাছে স্বাধীনতা মানে কী?’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা

আমরা জানি ব্যক্তি, স্থান কিংবা পরিস্থিতির ভিন্নতায় একেকজনের কাছে ‘স্বাধীনতা’ শব্দটির মানে একেকরকম। বিজয় দিবস উপলক্ষে ইয়ুথ অপরচুনিটিস আয়োজিত ‘আমার কাছে স্বাধীনতা মানে কী?’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের ১০৫৪ তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করে তাদের স্বাধীনতার মানে লিখিত আকারে প্রকাশ করে। তার মধ্যে থেকে বাংলা ও ইংরেজি বিভাগে মোট ১৪ জন বিজয়ী হন। এ আয়োজনের সহযোগী ছিল বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশন, *দ্য ডেইলি স্টার*, *ডিবিসি নিউজ টিভি* ও *প্রথম আলো* বন্ধুসভা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেশপ্রেমে দেদীপ্যমান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

‘আমি ভয় করবো না ভয় করবো না
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না...’

নির্ভীক, অতুলনীয় দেশপ্রেমে দীপ্যমান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের প্রাণসত্তা। সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির অজস্র মিথ্যা প্রচারণা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে কখনও মসীলিপ্ত করতে পারেনি। তিনি আমাদের প্রাণের নেতাজী। ইংরেজি ১৮৯৭ সালের ২৩শে জানুয়ারি উড়িষ্যার কটকে তাঁর জন্ম হয়। কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সিতে। অন্তরে প্রবল বৈরাগ্য– প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের বীর বাণী, গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন হিমালয়ে মুক্তির সন্ধানে। দেখলেন আপামর দীন দরিদ্র দেশবাসীকে খুব কাছ থেকে। ইংরেজদের শোষনে খুব কষ্টে সব দিন কাটাচ্ছে। ভাবলেন এভাবে হবে না, ফিরে এলেন কলকাতায়। কলেজে এসেও সেই একই অবস্থা দেখলেন– কলেজের স্বদেশী ছাত্রদের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ এই ইংরেজ অধ্যাপকদের। অধ্যাপক ওটেন ভারতীয় ছাত্রদের অপমান করছেন, তীব্র প্রতিবাদ করলেন, ফলে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন। স্যার আশুতোষের চেষ্টায় স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হলেন দর্শন শাস্ত্রে বিএ, এরপর এমএ– কিন্তু তার আগেই পিতার ইচ্ছায় চলে গেলেন ইংল্যান্ডে সিভিল সার্ভিস পড়তে– বসলেন আইসিএস-এ। দেখা গেল অসাধারণ মেধাবী সুভাষ চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন। দেশে ফিরে উচ্চ বেতনের সরকারী চাকরির প্রলোভন। দেশজননীর শৃঙ্খলমোচন তাহলে কিভাবে হবে? ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সে-সুযোগ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মী রূপে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে। সুভাষচন্দ্রের জীবনকথা এক অনবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দের চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক আপসহীন সংগ্রাম। নিজের স্বাধীন মনোভাবের জন্য আপসনীতিতে বিশ্বাসী কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। গড়ে তুললেন ফরোয়ার্ড ব্লক। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বরাবরই স্বকীয় স্বাধীন মতবাদে বিশ্বাসী ও অনমনীয় ছিলেন। বার বার কারান্তরালে থেকেছেন, কিন্তু হতোদ্যম হননি কখনও।

কবে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা হাত তুলে দেবে ভেবে বসে না থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে সুযোগ নিতে চাইলেন। অন্তরীণ অবস্থা থেকেই কলকাতার বাসভবন থেকে অন্তর্ধান করলেন। ছদ্মবেশে চলে গেলেন আফগানিস্তান– সেখান থেকে সোভিয়েত রাশিয়া হয়ে পৌঁছে গেলেন জার্মানি– গেলেন সেখান থেকে জাপান। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সেখানে গঠন করেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। সুভাষকে করলেন সর্বাধিনায়ক। উদাত্ত আহ্বান জানালেন সুভাষ– ‘তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।’ সিঙ্গাপুরে জেগে উঠল অকাতরে প্রাণ দেবার উন্মাদনা। সুভাষ বললেন– ‘স্বাধীনতা কেউ দেয় না, স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে হয়। উঠে দাঁড়াও, কোনও কিছু হারানোর নেই আমাদের, হাতে অস্ত্র তুলে নাও– চলো দিল্লি’। তাঁর প্রচারিত ‘জয় হিন্দ’ ধ্বনি ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বুকে জাগিয়ে তুলল স্বাধীনতার দুর্বার স্পৃহা। তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হিন্দু, মুসলমান, শিখ এক হয়ে এক বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের জন্মদান করল। সুভাষের নেতৃত্বে দিল্লির লাল কেল্লায় বিজয় নিশান ওড়াতে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে দেশবাসী উন্মাদ হয়ে উঠলেন। কদম কদম বাড়ায়ে যা– খুশিকে গীত গায়ে যা– শুরু হল ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক বীর্যদীপ্ত অভিযান। ভারতের ব্রহ্মসীমান্ত, আরাকান, টিড্ডিম, কোহিমা, ইম্ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর পদধ্বনি মন্দ্রিত হল। দুর্গম অরণ্য প্রান্তর অসংখ্য বীর সন্তানের বক্ষশোণিতে রক্তিম হয়ে উঠল। মণিপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনি প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার সে কী উল্লাস। দিল্লি চলো– দিল্লি চলো, ভারত ডাকছে। এর মধ্যে ঘটে গেল অনেক কিছু, ইংরেজ বাহিনি ব্রহ্মদেশ আবার দখল করে নিল, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে গেল, আজাদ হিন্দ সরকারের পতন হল। পরাজয়ের পরও সুভাষ নতুন পথের সন্ধান করতে লাগলেন। ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট সংবাদে প্রকাশ হল, জাপানে তাইহাকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি নিহত হয়েছেন। যদিও দেশবাসী তা বিশ্বাস করেননি। জন্মদিনের দেশপ্রেমিক, অক্ষয়ী বীর বিপ্লবী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম। ●

ইতিহাস

ঝিকরগাছায় মুছে যাচ্ছে আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের স্মৃতিচিহ্নগুলো

ডা. সুব্রত ঘোষ

সুউচ্চ বর্গাকারটি দেখে সবাই বলেন, এটা ফাঁসির মঞ্চ। কার ফাঁসির মঞ্চ? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। শীতের সকালে বাইক চালিয়ে যখন ঝিকরগাছার পায়রাডাঙ্গা শিশু সদনের মধ্যে পৌঁছলাম, তখন শিশু সদনের কিছু শিশু খেলা করছে মাঠে। পুরনো স্থাপনাটি দেখে বললাম, এটা কি? সব শিশুর উত্তর- শুনেছি এটা নাকি ফাঁসির মঞ্চ। পায়রাডাঙ্গা নয়, আশেপাশের মানুষ সবাই এটাকে ফাঁসির মঞ্চ বলে জানেন। কিন্তু তারা কেউ জানেন না এখানে কাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। পাশের মির্জাপুর গ্রামের শাহ জামাল শিশির বলেন, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি এটা ফাঁসির মঞ্চ। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা ওয়াচ টাওয়ার। এখানে নাকি ব্রিটিশ সৈন্যরা বসে আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করতেন। এর বেশি কিছু জানা যায় না। যশোরের ঝিকরগাছা ব্রিটিশ আমলে বিখ্যাত হয়ে আছে মোটাদাগে দুই কারণে, এক– নীলচাষের নির্মম সাক্ষী হিসেবে, দুই– ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকাটির জন্ম এখানেই– পরবর্তীকালে যেটা ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

অথচ সাত দশক আগে যে জনপদ রঞ্জিত হয়েছিল আজাদ হিন্দের বীর শহিদদের পবিত্র রক্তে, কপোতাক্ষ নদে যাঁদের অন্তিম ঠাঁই হয়েছিল– তাদের কথা অনেকেরই অজানা, এমনকি ইতিহাসবিদদের কাছেও এ ইতিহাস একাবারেই অধরা।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জে ব্রিটিশ আর্মির ট্রানজিট ক্যাম্পে আজাদ হিন্দ সেনাদের 'নেতাজি জিন্দাবাদ' 'আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। স্থানীয়দের তৎপরতা ও নেতাজিপ্রেমী-গবেষকদের প্রয়াসে নীলগঞ্জ ট্রাজেডির অনেককিছুই এখন উদঘাটিত। কিন্তু দেশভাগের পরিণতিতে চাপা পড়ে যায় ঝিকরগাছার বর্বরতার ইতিহাস।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত সরকার নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সংক্রান্ত বেশকিছু সরকারি নথি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করলে সেখানে ব্রিটিশ আর্মির ট্রানজিট ক্যাম্পগুলোতে বন্দী সেনানিদের ওপর বর্বরতার প্রমাণ মেলে। ব্যারাকপুরের নীলগঞ্জের সঙ্গে যশোরের ঝিকরগাছার নাম পাওয়া যাচ্ছে অসংখ্য ডকুমেন্টে। কানাইলাল বসুর *নেতাজি: রিডিসকভার্ড* গ্রন্থেও স্পষ্ট করে রয়েছে ঝিকরগাছার নাম। লেখক সংখ্যা উল্লেখ করতে না পারলেও এখানে বহু আজাদ হিন্দ সেনার অন্তরীণ রাখার কথা জানাচ্ছেন। এসব সেনার ভাগ্যে কী পরিণতি ঘটেছিল তা তিনি জানাতে পারেননি। সাত দশক আগে যে জনপদ রঞ্জিত হয়েছিল আজাদ হিন্দের বীর শহিদদের পবিত্র রক্তে, কপোতাক্ষ নদে যাঁদের অন্তিম ঠাঁই হয়েছিল– তাদের কথা হয়তো অনেকে জানেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেল, নৌ ও সড়ক যোগাযোগের সুবিধার্থে ব্রিটিশ বাহিনি কলকাতা থেকে অগ্রগামী ঘাঁটি তৈরি করে ঝিকরগাছাতে। যুদ্ধের শুরুতেই ১৯৩৯ সালে ঝিকরগাছা রেলস্টেশন, নৌ ঘাট সংলগ্ন এলাকার চারটি গ্রাম কৃষ্ণনগর, মোবারকপুর, পায়রাডাঙ্গা, কীর্তিপুরে চারটি ক্যাম্প করে ব্রিটিশ সৈন্যরা।

১৯৪৫-এ কিশোর তমিজউদ্দিন মোড়লের স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে সেইসব দিনের কথা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ তমিজ মোড়ল জানালেন, বড় সাইজের সব পেরেকে ঘেরা ব্রিটিশের সেনা ছাউনির কাছে স্থানীয়দের যাওয়ার সুযোগ ছিল না। কিছু সৈন্যদের এখানে এনে বন্দী করে রাখা হত, তাঁরা কারা কেউ চিনতেন না। মাঝেমধ্যে তাদের চিৎকার ধ্বনিও শোনা যেত দূর থেকে। কাছে গিয়ে দেখার সুযোগ ছিল না।

অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোশাররফ হোসেন জানান, সেনা ছাউনি বা আর্মিদের কর্মকাণ্ডের গোপনীয়তা রক্ষায় কৃষ্ণনগরের জনবসতির সিংহভাগই খালি করে ফেলা হয়। অনেকের মত তাদের পরিবারকেও চলে আসতে হয় অনেকটা দূরে। সেনা ছাউনির অভ্যন্তরে বহু হত্যাযজ্ঞ হলেও ধামাচাপা দিতে ব্রিটিশরা নজিরবিহীন গোপনীয়তা রক্ষা করে। ফলে ঝিকরগাছায় আজাদ হিন্দের সেনাদের ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছে তা স্থানীয়রা তখন ভালভাবে জানতে পারেনি। সংরক্ষণের অভাবে বিস্মৃতপ্রায় কৃষ্ণনগরের সেনা ছাউনির কিছু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় কপোতাক্ষ নদ ও কাটাখালের মোহনায় কাটাখাল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। কাটাখাল ব্রিজের কাছেই উনসত্তর বছরের মুদি দোকানি মো. রওশান আলীর পারিবার বসবাস করেন। আশৈশব কাটাখালেই বেড়ে ওঠা মুদি দোকানি রওশান আলীর তথ্য অনুযায়ী ব্রিটিশ আর্মির সামরিক ব্যাংকারের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কাটাখাল ব্রিজের পাশে কপোতাক্ষের মোহনায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন অবকাঠামো-বসতি গড়ে ওঠায় ব্রিটিশ আমলের সামরিক স্থাপনার কোনও কাঠামো আর টিকে নেই। তবুও কপোতাক্ষ নদের তীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু। তিনি বলেন, কৈশোরে এই কাটাখালে ও কপোতাক্ষের মোহনায় বহু মানুষের কঙ্কাল দেখেছি। বর্তমানে যেটা ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদ, সেখানেও ব্রিটিশের মিলিটারিরা থাকত। দেয়ালে-সীমানা প্রাচীরের চারদিকে তারকাটা-পেরেক পোতা থাকত। এদেরকে সামলাত গোর্খা সৈন্যরা– বলেন রওশন আলী। এই সামরিক ব্যারাক থেকে কিছু সেনার মুক্তি মিলেছিল।

এই অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম পুরোধা ইতিহাসবিদ হোসেনউদ্দীন হোসেন বলেন, ব্রিটিশ আর্মি ঝিকরগাছায় কৌশলগত কারণে সেনা ছাউনি স্থাপন করে। এর মুখ্য কারণ হচ্ছে– স্থানটি ব্যারাকপুরের কাছে এবং রেল ও নৌপথে যাতায়াত সুবিধা ছিল। এই ইতিহাসবিদ জানান, তাঁর জন্ম ১৯৪১ সালে। যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন তিনি অনেক ছোট। বাবা-মায়ের কাছে শুনেছেন, ব্রিটিশ আর্মি এখানে ক্যাম্প করার জন্য ৩৬ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিতে স্থানীয়দের সরে যেতে বাধ্য করে। ফলে তার পরিবার এখান থেকে ৬ কিলোমিটার দুরে এক গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ব্রিটিশ আর্মি চলে গেলে তার পরিবার আবার ঝিকরগাছায় ফিরে আসে। তিনি বলেন, শুনেছি বন্দি সেনারা যেন বিদ্রোহ করতে না পারে– তার জন্য ঝিকরগাছায় ৪টি ট্রানজিট ক্যাম্পে বিভক্ত করে রাখা হয় আজাদ হিন্দের সেনাদের। ক্যাম্পগুলো হচ্ছে– কৃষ্ণনগর, কীর্তিপুর, মোবারকপুর ও পায়রাডাঙ্গা। এর মধ্যে পায়রাডাঙ্গায় রাখা হত সবচেয়ে বিপজ্জনক সেনাদের। বর্তমানে সরকারি শিশুসদন হিসেবে ব্যবহৃত ওই স্থানটিতে আজাদ হিন্দের সেনাদের খুব গোপনে ফাঁসি দেওয়া হত। ফাঁসি কার্যকরে একটি বিশালাকারের বর্গাকার সুউচ্চ স্থাপনা তৈরি করা হয়। যার নীচে ছিল অন্ধকূপ। এই কূপের সঙ্গে সংযোগ ছিল স্রোতস্বিনী কপোতাক্ষের। জোয়ার-ভাটায় ফাঁসি হওয়া সেনার দেহ নদীতে ভেসে যেত। নদীর সঙ্গে সেই সুড়ঙ্গ বা কূপটি না থাকলেও বর্বরতার সেই স্মারক হিসেবে আজও টিকে আছে ফাঁসি কার্যকরের উঁচু ঘরটি। তিনি জানান, নির্মম নির্যাতন করে আজাদ হিন্দ সেনাদের হত্যার দৃশ্য মনে করে আজও শিউরে ওঠেন। কৃষ্ণনগরে ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদের পাশে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। ব্রিটিশ আর্মি এই বটগাছে বেঁধে আজাদ হিন্দের জওয়ানদের নির্যাতন করত। একপর্যায়ে গুলি করতে হত্যা করত। হোসেনউদ্দীন হোসেন বলেন, তিনি শুনেছেন মীর জাহান আলী নামে পেশোয়ারের এক আজাদ হিন্দ সেনাকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'কৃষ্ণনগরের ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে একটি ট্রেঞ্চ রেলস্টেশনের পাশের পৌরখাল হয়ে কপোতাক্ষ নদীতে পতিত হয়েছে। এই খাল দিয়ে নদীতে লাশ ভাসিয়ে দিত ব্রিটিশ সৈন্যরা। কালের পরিক্রমায় বাড়িঘর হয়ে যাওয়ায় ট্রেঞ্চটি হারিয়ে গেছে।' পায়রাডাঙ্গার শিশু সদনের অভ্যন্তরে এখনও টিকে আছে বর্বরতার সেই নিদর্শন ফাঁসির ঘরটি। ঘরটির চূড়ায় একটি মেশিন বসানো ছিল বলেও জানালেন শিশু সদনে কর্মরত কর্মচারী ও স্থানীয়রা।

স্বাধীন ভারতের কোনও রাজনৈতিক দল, নেতা বা সরকারি কর্মকর্তা স্থানটিতে শহিদদের জন্য কোনও স্মৃতিফলক নির্মাণের উদ্যোগ নেননি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় মুক্তিসংগ্রামীদের এতবড় আত্মত্যাগের কোনও মূল্যই দেননি কেউ, অযত্নে অবহেলায় অধিকাংশ স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংসের পথে, বাকিগুলোও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

ডা. সুব্রত ঘোষ, চিকিৎসক ও সমাজকর্মী

উন্নয়ন

জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ সংহতি

সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫ (এ) ধারা রদের ফলে রাজনৈতিকভাবেই শুধু নয়, জম্মু-কাশ্মীরের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংযুক্তিকরণও সম্ভব হয়েছে। এক বছরেরও বেশি সময় আগে রাজ্যটিকে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ– দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এর আগে শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন, শিক্ষার অধিকার, ভূমি অধিগ্রহণ আইন, বহু প্রতিবন্ধকতা আইন, প্রবীণ নাগরিক আইন, পুনর্গঠন আইন, সত্যসন্ধানীদের সুরক্ষা আইন, উপজাতিদের ক্ষমতায়ন আইন, জাতীয় নাবালক কমিশন, জাতীয় শিক্ষা শিক্ষণ পরিষদের মত বিভিন্ন আইন সংবিধানের ৩৭০ ধারার কারণে জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য ছিল না; ৩৭০ ধারা বাতিলের পর বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী শুরু হয়েছে। এর হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে সমৃদ্ধি আসছে।

কাশ্মীরের বাইরের মানুষ এখন এই এলাকায় জমি কিনতে পারে। মেয়েরা যদি এখন রাজ্যের বাইরে কাউকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের জমির অধিকার হারাবেন না। বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন বিভাজিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দু'টি– জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের সন্ত্রাসবাদী অধ্যুষিত এলাকা রূপে গড়ে ওঠা ভাবমূর্তির বদলে নতুন ভারতের নতুন উন্নয়নের পথে অগ্রগণ্য অঞ্চল রূপে পরিগণিত হচ্ছে। এখানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের হার ৩৫ শতাংশ কমেছে।

ভূ-স্বর্গের জন্য নতুন ভোর

- সব বৈষম্যমূলক এবং অবিচারের রাজ্য আইন হয় বাতিল করা হয়েছে, নয়তো সংশোধিত হয়েছে। তপশিলি জাতি, উপজাতি, বনবাসী, নাবালক ও প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৭০টির বেশি কেন্দ্রীয় আইন এখন কার্যকর হয়েছে;
- লখনপুর টোল ব্যবস্থা তুলে নেওয়ায় জম্মু-কাশ্মীরে 'এক দেশ, এক কর' ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে;
- জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় ডোমিসাইল আইনটি কার্যকর হয়েছে। পূর্বতন স্থায়ী নাগরিক শংসাপত্র অধিকারীরা এখন ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারছেন। আগে এ বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তু, গোর্খা, সাফাই কর্মচারী, যে-সব মহিলা অন্য রাজ্যে বিয়ে করেছেন, তাদের সঙ্গে বৈষম্য করা হত;
- প্রাক্তন মন্ত্রীরা যে-সব নিয়মবহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা পেতেন, সেগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং রাজনীতিবিদদের জন্য পেনশনের ক্ষেত্রে এখন ঊর্ধ্বতন সীমা কার্যকর হচ্ছে;
- ৩৭০ ও ৩৫(এ) অনুচ্ছেদ রদের পর সরকার বিভিন্ন আইনের সংশোধন করে এই কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীরের বাইরের নাগরিকদের জমি কেনার সুযোগ করে দিয়েছে;
- সৌভাগ্য প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৩,৮৭,৫০১ জন সুবিধাভোগীর সকলেই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন;
- মিশন ইন্দ্রধনু (জম্মু): ১৩৫৩টি শিশু এবং ৩৮১জন গর্ভবতী মহিলার টিকাকরণ হয়েছে;
- জিএসও-এর আওতাধীন উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা বরামুলা ও কূপওয়াড়ায় মিশন ইন্দ্রধনু: ২২৫১টি শিশু এবং ৩২০জন মহিলার টিকাকরণ হয়েছে;
- স্বচ্ছ ভারত মিশনে জম্মু ও কাশ্মীর দেশের অন্য জায়গা থেকে এগিয়ে রয়েছে। ১০০ শতাংশ খোলা স্থানে শৌচ করা বন্ধ হয়েছে;
- গত এক বছরে আইএসএসএস প্রকল্প, সংখ্যালঘুদের প্রাক-মেট্রিক বৃত্তি প্রকল্পে ৪,৭৬,৬৭০জনকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে পেনশনের সুবিধা পাচ্ছেন ৭,৪২,৭৮৯ জন;
- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে ১১.৪১ লক্ষ গোল্ড কার্ড দেওয়া হয়েছে। ৩,৪৮,৩৭০টি পরিবার উপকৃত;
- পিএম কিষাণ যোজনার বাস্তবায়নে জম্মু-কাশ্মীর এগিয়ে মাত্র এক বছরে ৯.৮৬ লক্ষ সুবিধাভোগী প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন;
- জমি নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়া আদালতের থেকে কার্যনির্বাহীদের কাছে গেছে। ৭৭ জন সাব-রেজিস্ট্রারকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ই-স্ট্যাম্পের নিয়মাবলী তৈরি করা হয়েছে;
- বিদ্যুৎ দপ্তরের সংস্কার: ৫টি নিগম তৈরি হয়েছে;
- কাশ্মীর জাফরান জিআই ট্যাগ পেয়েছে।

জাফরান চাষের প্রসার

জাফরান চাষের উন্নতি ও প্রসারে জাতীয় জাফরান মিশরের আওতায় ভারতের 'জাফরান উৎপাদন গোলা'-র উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সিকিমেও সম্প্রসারিত করা হচ্ছে

কৃষকের আয় দ্বিগুণ বাড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র্য এনে দ্বৈত উদ্দেশ্য পূরণের পাশাপাশি আত্মনির্ভর ভারত গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও জাফরান চাষ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। আগে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের পাম্পোর অঞ্চলে জাফরান চাষ সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চল পরিচিত ছিল 'জাফরান উৎপাদনের গোলা' হিসেবে। এছাড়াও বড়গাও, শ্রীনগর ও কিস্তোয়ারের মত কয়েকটি জেলাতে জাফরান চাষ হয়ে থাকে। নতুন চারাগাছ কাশীর থেকে সিকিমে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সিকিমের দক্ষিণ দিকে ইয়ংইয়ং-এ রোপণ করা হয়েছে। ভারতে বার্ষিক জাফরান উৎপাদনের পরিমাণ ৬-৭ টন, অন্যদিকে চাহিদা প্রায় ১০০ টন। বাড়তি এ চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রক উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্যে (বর্তমানে সিকিম এবং পরে মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের মাধ্যমে জাফরান চাষ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাশ্মীরের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি এলাকার আবহাওয়া ও ভৌগোলিক সাদৃশ্য রয়েছে। দক্ষিণ সিকিমের ইয়ংইয়ং গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নর্থ-ইস্ট সেন্টার ফর টেকনোলজি অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড রিচ (এনইসিটিএআর)-এর সহযোগিতায় সিকিম কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদালয়ের বোটানি ও হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে জাফরান চাষের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ দপ্তরের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে ইয়ংইয়ং গ্রামের চাষযোগ্য মাটি ও পরিবেশ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং কাশ্মীরের মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ বিভাগের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে জাফরান বীজ ইয়ংইয়ং গ্রামে নিয়ে আসা হয়েছে এবং একজন জাফরান চাষীকে কাজে যুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক জাফরান চাষের অগ্রগতির বিষয়ে নজর রাখছেন। কাশ্মীর থেকে নিয়ে আসা জাফরান বীজগুলো সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বপন করার পর সঠিক মাত্রায় জল দেওয়া হয়েছে। এর পর সেই বীজ থাকে সময়মত অঙ্কুর বেরোনো শুরু হয়েছে। কাশ্মীরের পম্পোর এবং সিকিমের ইয়ংইয়ং গ্রামের মধ্যে জলবায়ু ও ভৌগোলিক সাদৃশ্য থাকায় জাফরান চাষ সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ●

সুবিধা

- জাফরান চাষের সম্প্রসারণের ফলে ভারতে বার্ষিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে এবং আমদানী নির্ভরশীলতা কমবে।
- কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আসায় উত্তর-পূর্ব ভারতে কৃষকদের উপার্জনের নতুন রাস্তা খুলে যাবে।
- ভারতে প্রায় ৬-৭ টন জাফরান উৎপাদিত হয়, তবে চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১০০ টন।

জনসাধারণের জন্য নতুন আশা

- পুলওয়ামা জেলার ওখু গ্রাম ভারতের 'পেনসিল ভিলেজ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশের মোট স্লেটের ৯০ শতাংশ এখানে তৈরি হচ্ছে;
- চেনাব নদীর ওপর পিএমডিপি-র আওতায় ৪৬৭ মিটার দীর্ঘ বিশ্বের উচ্চতম রেণসেতুর কাজ চলছে; আগামী বছরে এটি শেষ হবে;
- আইআইটি জম্মুর পড়াশুনা তার নিজস্ব ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে। জম্মুর এইমসহ কাশ্মীরে অন্য এইমসসহ কাজও শুরু হয়েছে;
- বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। ১০০০ মেগাওয়াট পাকাল দুল প্রকল্প এবং ৬২৪ মেগাওয়াট কিরু প্রকল্পের কাজের জন্য ঠিকাদার বাছাই করা হয়েছে;
- বৃহত্তম নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে– ১০,০০০ জনকে নিয়োগ করা হবে; বিশেষ নিয়োগ নিয়মাবলির ফলে আরও ২৫,০০০ কর্মসংস্থান হবে;
- হিমায়ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর মান কি বাত-এ এর প্রশংসা করেছেন। ৭৪,৩২৪ জন প্রার্থীর প্রশিক্ষণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গত দু'বছরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছে;
- আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩৬০০ কোটি টাকার ১৬৮টি প্রকল্পের সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত; শিল্পের জন্য ৬০০০ একর সরকারি জমি চিহ্নিত; ৩৭টি শিল্পতালুক গড়ার জন্য জমি হস্তান্তর;
- প্রথমবারের মত জম্মু-কাশ্মীরে ব্লক উন্নয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে; ভোটদানের হার ৯৮.৩ শতাংশ;
- আপেলের জন্য অনন্য বাজার প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে আকর্ষণীয় দাম পাঠানো হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মাধ্যমে পরিবহনের কাজ হয়েছে;
- সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ৫২০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ অনুমোদন করেছে;
- জম্মু ও শ্রীনগরের মধ্যে মেট্রোর বিস্তারিত প্রকল্পের প্রতিবেদন তৈরি হয়েছে।

সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

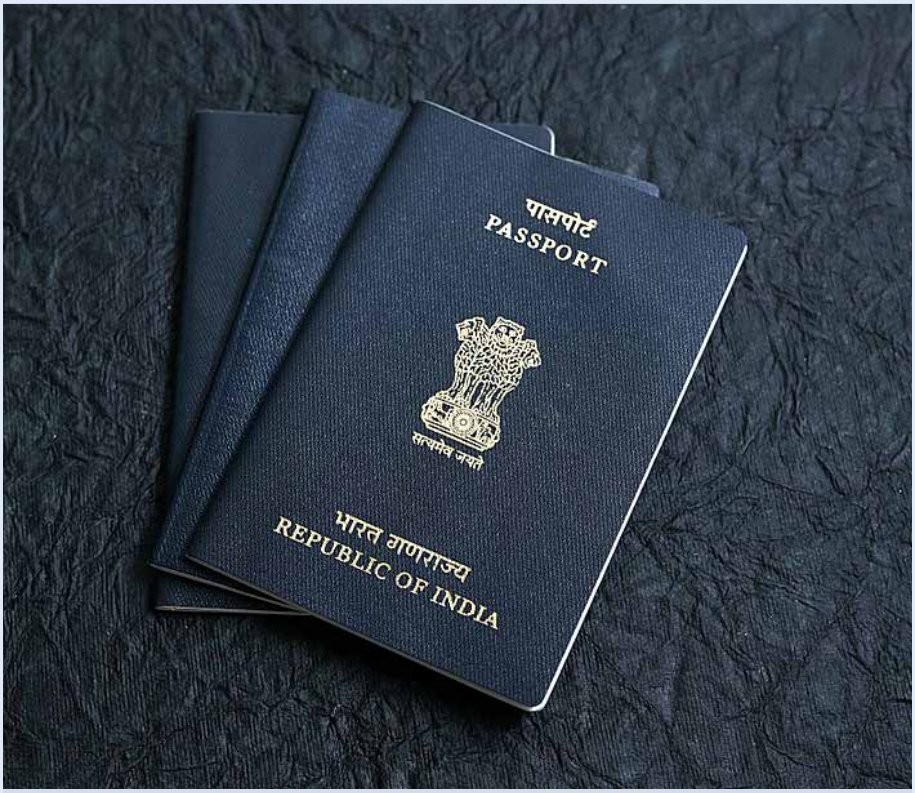

ভারতীয় পাসপোর্টের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একইসঙ্গে ভারতীয় পাসপোর্টের ক্ষমতাও বেড়েছে। গত ৬ বছরে সরকার এক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্তন এনেছে এবং নানাবিধ সংস্কার বাস্তবায়িত করেছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফল ইতোমধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সূচকে ভারত ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসছে। জাতীয় ই-গর্ভন্যান্স পরিকল্পনার আওতায় বিদেশমন্ত্রকের পাসপোর্ট সেবা কর্মসূচী এরকমই একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প। বিদেশমন্ত্রকের নাগরিক কেন্দ্রীয় উদ্যোগের ফলে পাসপোর্ট ইস্যু করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধে হচ্ছে। মন্ত্রক ২০১৯ সালে ১ কোটিরও বেশি পাসপোর্ট ইস্যু করে। দেশজুড়ে কোভিড-১৯ মহামারীর আগে প্রতিমাসে ১০ লক্ষ পাসপোর্ট ইস্যু করা হচ্ছিল। পাসপোর্টের সুরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এর মধ্যে জাতীয় ফুল পদ্মের ছাপ দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন: 'যাঁরা বিদেশে রয়েছেন এবং বিদেশে যাতায়াত করেন, তাঁরা হয়তো জানবেন, আজ ভারতীয় পাসপোর্টের সম্মান কতটা। আমার মনে হয়, এর আগে কেউ ভারতীয় পাসপোর্টের এতটা ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারেননি।'

পরিবর্তনসমূহ

- টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস (টিসিএল)-এর সঙ্গে পাসপোর্ট সেবা প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণ উন্নতমানের পরিষেবা পাচ্ছেন;
- বিদেশমন্ত্রক পাসপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়মকানুন সহজ করেছে, এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন করে প্রয়োজনীয় নথি জমা দেবার সময় জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে;
- আবেদনকারী ভারতের যে কোনও প্রান্ত থেকে পাসপোর্টের আবেদন করতে পারেন। ফর্মে যে ঠিকানা দেওয়া থাকবে, সেখানে পুলিশ ভেরিফিকেশনের কাজ হবে এবং পাসপোর্ট ঐ ঠিকানাতে পাঠানো হবে;
- এমপাসপোর্ট সেবা মোবাইল অ্যাপ ২০১৮ সালে চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে আবেদনকারী পাসপোর্টের জন্য আবেদন, প্রয়োজনীয় টাকা জমা দেওয়া এবং অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পেতে পারেন। পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র এবং পিওপিএসকে-এর অবস্থান, মাসুল, আবেদন জমা দেবার পদ্ধতি, পাসপোর্টের আবেদনের স্টেটাস স্মার্টফোনে জানতে পারবেন;
- আবেদনকারী ৫টি তারিখের থেকে নিজের সুবিধেমত অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ বাছাই করতে পারবেন;
- জাতীয় ফুল পদ্মের ছপি পাসপোর্টে থাকায় সুরক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভুয়ো পাসপার্ট বানানো বন্ধ হবে;
- সরকার পাসপোর্ট সেবা কর্মসূচির সঙ্গে মিশনগুলোকে সংযুক্ত করেছে।

ভারতীয় পাসপোর্টের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি

ভ্রমণ সংক্রান্ত সুবিধের রেটিং

হেনলি পাসপোর্ট সূচক অনুসারে ২০১৯ সালে সহজে ভ্রমণ করার নিরিখে ভারত একধাপ উঠে ৮০তম স্থানে পৌঁছেছে। ২০১৫ সালে প্রথমবার যখন ই-ভিসা চালু করা হয়, সেই সময় ভারতের স্থান ছিল ৪৪। আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের সূচকে ভারতের স্থান ৪৮, ২০১৯ সালে এই সূচক অনুসারে যা ছিল ৭১।

সহজে ব্যবসা করার সুযাগে

বিশ্বব্যাঙ্কের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে ২০২০ সালের হিসেবে ১৯০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৬৩। এবছর ভারত ১৪ ধাপ উঠে এসেছে।

বিশ্ব ডিজিটাল প্রতিযোগিতার ক্রমতালিকা

জ্ঞান এবং নতুন প্রযুক্তির বিষয়ে ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির নিরিখে ডিজিটাল প্রতিযোগিতার হিসেবে ভারত চার ধাপ উঠে ৪৪তম স্থানে পৌঁছেছে। আইএমডি ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল কমপিটিটিভনেস র‍্যাঙ্কিং অনুসারে ৬৩টি দেশের মধ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে অর্থনৈতিক পরিবর্তন, ব্যবসা বাণিজ্য, সরকারি কাজকর্ম এবং সমাজকে কতটা সুবিধে দিতে পারে, সেই হিসেবেই করা হয়।

আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচক

উন্নয়নের মূল শক্তি হল উদ্ভাবন– ভারত সরকার এ নীতিতে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক উদ্ভাবন সূচক অনুসারে ১৩১টি দেশের অর্থনীতির মধ্যে ভারতের স্থান ৪৮তম। ২০১৯ সালের নিরিখে চার ধাপ উঠে এসেছে ভারত। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে উদ্ভাবনমূলক অর্থনীতির হিসেবে ভারত শীর্ষস্থান দখল করেছে।

বিশ্ব প্রতিযোগিতার সূচক

ইনস্টিটিউট ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভলপমেন্ট (আইএমডি)-র বার্ষিক বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক সূচকে এবছর ভারতের স্থান ৪৩। ২০১৭ সালে ৪৫তম এবং ২০১৮ সালে ৪৪তম স্থানে ভারত ছিল। এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত এক উদীয়মান শক্তি।

আন্তর্জাতিক শক্তির অন্তর্বর্তীকালীন সূচক

২০২০ সালের আন্তর্জাতিক শক্তির অন্তবর্তীকালীন সূচকে আর্থিক বৃদ্ধি, জ্বালানির সুরক্ষা ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বিবেচনা করে ভারত দুই ধাপ উঠে ৭৪তম স্থানে পৌঁছেছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম জানিয়েছে যে, সরকারের পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচীর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। ২০১৭ সালের মধ্যে ২৭৫ গিগাওয়াট, এই ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ইডেলম্যান ট্রাস্ট ব্যারোমিটার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বাধীন জনসংযোগ সংস্থা ইডেলম্যান ট্রাস্ট ব্যারোমিটার সরকারের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বিবেচনা করে ভারতকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছে। ২০২০-র জানুয়ারি থেকে ভারত সরকারের পক্ষে ৭ শতাংশ সমর্থন বেড়েছে। ভারতের মত খুব কম দেশেরই আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে ২ সংখ্যার স্থিতিশীল সূচক বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। চিনের মত কিছু বড় দেশের ক্ষেত্রে এই আস্থা দ্রুত অর্জিত হলেও তারা সেই ধারা বজায় রাখতে পারেনি।

- সূত্র নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

সংস্কৃতি

যাত্রাপালার একাল ও সেকাল

অরবিন্দ মণ্ডল

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

যাত্রাশিল্পের সূচনা কবে থেকে হয়েছিল তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা রয়েছে। মঞ্চায়নের মাধ্যমে কবে এই যাত্রাপালা শুভযাত্রা করেছিল তার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া ভার। 'ঋগ্বেদ' এর অনেক সূক্তে কথোপকথন বা সংলাপ বিদ্যমান। এই সংলাপমণ্ডিত সূক্তগুলি নাট্যগুণে গুণান্বিত। এখানে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য উভয় বৈশিষ্ট্যই লালিত। ঋগ্বেদের ১০/১০ এ যম-যমী সূক্ত, ১০/৯৫ এ পুরূরবা-উর্বশী সূক্ত এবং ৪/১৮ এর ইন্দ্র-অদিতি-বামদেব প্রভৃতি সূক্তগুলি কথোপকথনের ধারায় রচিত। তবে ঋগ্বেদের এই সূক্তগুলো কখনও মঞ্চে অভিনীত হয়নি। 'ঋগ্বেদ' নাট্যারম্ভের সূচনা করলেও বৈদিক আমলে বেদ সর্বজনপঠিত এবং শ্রুত গ্রন্থ ছিল না। ভরতমুণির নাট্যসূত্রে আছে প্রাচীনকালে জম্বুদ্বীপে অর্থাৎ ভারতবর্ষে 'গ্রাম্যধর্ম প্রবৃত্ত' হয়ে কাম ও লোভের বশবর্তী হলে জনগণের হৃদয়ে ঈর্ষা ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

সমাজের এই বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্যে মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গিয়ে একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রব্য এমন একটি 'ক্রীড়নীয়ক' সৃষ্টির প্রার্থনা জানালেন, যাতে সর্ববর্ণের এবং সবার অধিকার থাকে এবং যার প্রয়োগে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ব্রহ্মা যে 'ক্রীড়নীয়ক' সৃষ্টি করলেন তাই নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদ। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে ব্রহ্মা এই পঞ্চমবেদ আচার্য ভরতকে প্রদান করেন এবং তার শতপুত্র নিয়ে সেই নাট্যবেদ চর্চার আদেশ দেন। 'মহেন্দ্র বিজয়োৎসব' উপলক্ষে আচার্য ভরত, ব্রহ্মা রচিত ও নির্দেশিত 'দেবাসুরসংগ্রাম' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। ব্রহ্মা রচিত দ্বিতীয় নাটকের নাম 'অমৃতমন্থন' এবং তৃতীয় নাটকের নাম 'ত্রিপুরদাহ'। ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাটকের এভাবেই যাত্রা শুরু। যাত্রার উৎপত্তি হিসেবে বেশিরভাগ গবেষক পাঁচালীকে উৎস হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। তবে পাঁচালীর সঙ্গে যাত্রার পার্থক্য এই যে, পাঁচালীতে মূলগায়েন বা পাত্র (চরিত্র) একটি মাত্র; যাত্রায় একাধিক। ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের পর চিত্রপট অঙ্কন করে শঙ্করদেব নাচগান সহযোগে যে 'ভাওনা' করেছিলেন তার নাম ছিল 'চিহ্নযাত্রা'। 'হরিবংশ' গ্রন্থে বন-যাত্রার কথা লিখিত আছে। 'অভি' অর্থে সম্মুখে আর 'নী' অর্থে নিয়ে আসা বা তুলে ধরা। যে কোনও বিষয় বা ঘটনাকে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপনই অভিনয়। মানুষ যখন ভাষার ব্যবহার শেখেনি, একজনের প্রয়োজন আরেকজনকে বোঝাতে অক্ষম তখন বিভিন্ন আকার-ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজের মনের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করতো। অঙ্গভঙ্গিরমাধ্যমে কোনও দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপনই 'অভিনয়'। শ্রবণ ও বাক্‌প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আজও অভিনয়ের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব অন্যের নিকট পরিস্ফুট করার প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। অভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শিত না হলেও পাঠক যখন কোনও কাব্য পাঠে ব্রতী হন, তখন তিনি নিজের মনে পঠিত বিষয়ের একধরনের দৃশ্য কল্পনা করেন। দৃশ্যকাব্যকে বাংলা

ভাষায় বলা হয়েছে 'অভিনেয়'। অভিনেয় শব্দের অর্থ হল অভিনয় উপযোগী বা অভিনয় করার যোগ্য। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রা-পালাকার পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বলেছেন, দেবদেবীর প্রতিমা নিয়ে রাজপথে যে শোভাযাত্রা বেরুত তার মধ্যে বিভিন্ন কণ্ঠের গান ও বিভিন্ন ব্যক্তির নাচের অনুষ্ঠান হত। এই শোভাযাত্রাই একসময় পথ থেকে উঠে এল মাঠে, বাগানে বা ধনীর প্রাঙ্গণে। শোভাযাত্রা তখন 'যাত্রায়' নামান্তরিত হল। কোন্ শতাব্দী থেকে এটি যাত্রা আকারে মঞ্চে এল সে সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষকের মতামতের ভিত্তিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাত্রাশিল্পের শুরু। জানা যায়, দ্বাদশ শতকে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' পালাগানে তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী নাচতেন।

তবে নাটকের শুরু খ্রিস্টের জন্মের আগে। গৌতম বুদ্ধের মহানির্বাণ বা মৃত্যু হয় ৫৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক দুই শিষ্য মৌদগল্যন ও উপতিষ্যের খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভাষ্য 'ললিতবিস্তার'এ সিদ্ধার্থের নাট্য-অভিনয়-কুশলতার কথা বলেছেন। শুরুতে ছন্দে রচিত ধর্মীয় কাহিনিভিত্তিক বিশেষত পৌরাণিক কাহিনিগুলিকে পালায় গ্রথিত করে গদ্যসংলাপ দিয়ে মঞ্চায়নের কাজ শুরু হয়। শুরুতে সংগীতের প্রাধান্য বেশি ছিল; আজকের দিনের অনেকটা 'গীতিনকশার' মত। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*, বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* ইত্যাদি ধর্মীয় কাহিনিনির্ভর পালা শোনা যেত। পালাকাররাও অভিনয়ে অনেক সময় অংশ নিতেন। কথিত আছে, চণ্ডীদাস যাত্রায় অভিনয়কালে মণ্ডপের ছাদ ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে স্বয়ং কৃষ্ণলীলায় অভিনয় করেন। কৃষ্ণ সেজেছিলেন অদ্বৈত আচার্য আর শ্রীরাধা ও রুক্মিণীর দ্বৈত ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য।

যাত্রাবই ও আঙ্গিক

যাত্রাপালা রচিত বইগুলির আকৃতি সাধারণত ৭ ইঞ্চি লম্বা এবং ৫ ইঞ্চি প্রস্থের হয়ে থাকে। প্রোমোটররা প্রোমোট করার সময় বইটিকে মুঠোর ভেতর রেখে ব্যবহার করেন বলেই এর কভার সামান্য মোটা কাগজে তৈরি করা হয়; বোর্ডবাইণ্ডিং করা হয় না। পাঁচালীর আমলে একটিমাত্র চরিত্রই মূখ্য অর্থাৎ মূলগায়েন হিসেবে উপস্থাপিত হত এবং পার্শ্বচরিত্রের সংখ্যা হাতেগোনা দু'তিনটিতে সীমাবদ্ধ থাকত। অধুনা যাত্রাপালায় চরিত্রের সংখ্যা সর্বনিম্ন সতের এবং সর্বোচ্চ ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ।

যাত্রাপালায় পাঁচটি অঙ্কের মধ্যে বিশ থেকে বাইশটি দৃশ্য থাকে। প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য; এই চারটি দৃশ্যের মধ্যে সকল চরিত্রের উপস্থাপন ও ঘটনার বিষয় সম্পর্কে সংলাপের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাকে অবহিতকরণ। দ্বিতীয় অঙ্কে পঁচটি দৃশ্য এবং ঘটনার ঘনঘটা শুরু; দর্শক-শ্রোতাদের উদ্বিগ্নতার পালা, বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আলোচনা। তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য এবং ঘটনার চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে ধাবমান; দর্শক-শ্রোতারা বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে নিজেদের মনে টানাপড়েন শুরু করে। চতুর্থ অঙ্কে দৃশ্যের সংখ্যা তিনটি বা চারটি; ক্ষেত্রবিশেষে পাঁচটিও থাকতে পারে। এই অঙ্ক থেকে ঘটনা নিষ্পত্তির দিকে যায়; অনেক চরিত্র বিলুপ্ত হতে থাকে। পঞ্চম বা শেষ অঙ্কে দৃশ্যের সংখ্যা তিনটি। বেশিরভাগ পালাকার দুইটি দৃশ্যেই যবনিকা টানতে চান। এই দৃশ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্ফূরণ ঘটে; দর্শক-শ্রোতারা অনেকটাই আঁচ করতে পারেন, কাহিনি কোন দিকে পরিণতি পাচ্ছে। এই অঙ্কেই যবনিকা টানেন পালাকার। অনেকক্ষেত্রে অঙ্ক ছাড়াই কেবল দৃশ্যের মাধ্যমে বিশ থেকে তেইশটি দৃশ্যে যাত্রাপালা শেষ হতে পারে।

যাত্রাপালা মঞ্চায়নের পূর্ব মুহূর্তেই মিউজিক পার্টি হারমোনিয়াম, কেসিও, বাঁশি, ক্লারিনিওট, ঢোল, তবলা, মৃদঙ্গ, ফুলোট প্রভৃতি সহযোগে উচ্চগ্রামে একটি মনোজ্ঞ সুর তুলে দর্শক-শ্রোতাদের মনকে মঞ্চে নিবদ্ধ করে; যাত্রাজগতে এর নাম 'কনসার্ট'। যাত্রাপালায় এই কনসার্টের গুরুত্ব অপরিসীম। দর্শক-শ্রোতাদের অভিমত– এই কনসার্ট ভাল হলে মঞ্চায়ন পালাও মধুরতর হয়। দাস্য, সখ্য, হাস্য, বীভৎস, শান্ত, মধুর, করুণ, রুদ্র, বীর এই নবরসে সিঞ্চিত বর্তমানের যাত্রাপালা। নায়ক-নায়িকা ও পার্শ্ব চরিত্রগুলির সঙ্গে দু'তিনজন কৌতুক অভিনেতাও এই চরিত্রের মাঝে স্থান পায়। এই কৌতুক অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি দর্শনের জন্য অনেক শ্রোতার সম্মিলন ঘটে। খল চরিত্রের অভিনেতার কুটিল মনকে সুপথে আনার জন্যে সন্ত-সন্ন্যাসীর বেশে গীতকণ্ঠে একজন অভিনেতাকে উপস্থাপন করা হয়। শ্রোতাজগতে এই অভিনেতা 'বিবেক' নামে পরিচিত। আরও একটি (পালার প্রয়োজনে দুইজনও হতে পারে) সুরেলা কণ্ঠের কিশোরকে উপস্থাপন করেন পালাকার, যে 'একানি' নামে পরিচিত।

সতের থেকে বাইশ বা তেইশটি পুরুষ চরিত্র এলেও নারী চরিত্র চারটির অধিক নয়। এখনকার দিনে কোনও নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। নারী চরিত্রের অভিনেত্রীরা সাধারণত সম্মানীর বিনিময়ে অভিনয় করে থাকেন। ফলে ব্যয়ের দিকটা খেয়াল রাখতে গিয়ে পালাকার নারী চরিত্র কম রাখেন। যত যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয় তার প্রায় সত্তর শতাংশ পালা করে সৌখিন যাত্রাশিল্পীরা। কোন পার্বণ উপলক্ষ্যে মঞ্চায়নের জন্য যাত্রাপালা খুঁজতে গিয়ে সৌখিন অভিনেতারা বইটি খুলেই দেখে নেন, পালাটিতে কয়টি নারী চরিত্র আছে। সাধারণত তিনটি বা চারটি নারী চরিত্রের যাত্রাপালাই তাদের মন কাড়ে। এজন্য পালাকাররাও পালা রচনার সময়ে নারী চরিত্র তিন বা চারের মধ্যে সীমিত রাখেন। অনেক পালাকার চরিত্রের পাশাপাশি বয়স উল্লেখ করেন (যেমন বৌদির ঘরে দাদা কাঁদছে)।

যাত্রাপালার যাত্রার শুরুতে কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষয় ছিল। বর্তমানে যাত্রাপালার বিষয় পৌরাণিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, সামাজিক, গোয়েন্দা কাহিনি নির্ভর। গোয়েন্দা, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালাগুলিতে রাজকীয় ও জমকালো পোশাকের প্রয়োজন হয় কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় পালাগুলিতে রাজকীয় পোশাক গৌণ হয়ে গৃহস্থের বেশভূষাই প্রাধান্য পায়। তবে কম বাজেটের সৌখিন যাত্রাপালায় সব সময় যথাযথ পোশাকের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

যাত্রার সংলাপ সব সময় মুখস্থ করা সম্ভব হয় না। ফলে একজন ব্যক্তি অস্ফুট উচ্চারণে অভিনেতার কানে সংলাপ পৌঁছে দেন। ইনি 'প্রোমোটার' নামে পরিচিত। তিনি অস্ফুট উচ্চারণে অভিনেতাকে সংলাপ শুনিয়ে দেন; অভিনেতা তা তুলনামূলক উচ্চশব্দে অভিনয় সহকারে মঞ্চে নিক্ষেপ করেন। প্রোমোটার সাধারণত বাদ্যদলের একপাশে উপবেশন করেন। এই প্রোমোটার নারী-পুরুষের সকল চরিত্রই স্বর বিকৃতির মাধ্যমে উপস্থাপনে দক্ষ, তাই তাঁর গুরুত্ব খুবই বেশি। সকল অভিনেতা যে স্থান হতে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে মঞ্চে ছুটে আসেন এবং সংলাপ শেষে যেখানে ফিরে বিশ্রাম নেন বা পরবর্তী মঞ্চের দৃশ্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করেন, সেই স্থানটির নাম 'গ্রিন রুম'।

যাত্রাশিল্পী ও দর্শক-শ্রোতা : অতীত

উনবিংশ-বিংশ শতকের শিল্পীরা ছিলেন মজ্জাগত যাত্রাশিল্পী। পেশাগত দিকের বিবেচনা না করে তার উপর অর্পিত চরিত্র কেমন করে মঞ্চে রূপায়ন করতে হবে সেই চিন্তাই তার চেতনার মাঝে সারাক্ষণ ঘুরপাক খেত। তিনি কত টাকা বেতন পান বা তার সংসারে সচ্ছলতা আছে কি-না এ বিষয়টা মাথায় না নিয়েই অর্পিত চরিত্রটি অবিকল দর্শক-শ্রোতার সামনে তুলে ধরাই ছিল তৎকালীন যাত্রাশিল্পীর সার্বক্ষণিক চেষ্টা। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। তখন নট্টকোম্পানি (অপেরা ইউনিট)-তে পঞ্চু সেন অভিনেতা ছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কোনও চরিত্রের মেক-আপ নিজের বাড়ি থেকে করে নিয়েই অথবা ইউনিট স্টুডিও থেকে নিজে নিজেই মেক-আপ করে বেরুতেন, কোনও মেক-আপ ম্যান-এর সহযোগিতা গ্রহণ করতেন না। কোনও এক মঞ্চে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার ভূমিকায় অভিনয় শেষে নিজের গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছেন। পথিমধ্যে গভীর রাতে টহল পুলিশ তাঁর গাড়িটিকে দাঁড়াবার জন্যে সিগন্যাল দিলেও গাড়ি থামাতে নিষেধ করলেন নবাবী পোশাকে সজ্জিত পঞ্চু সেন। পরদিন পুলিশ হানা দিল যাত্রাভিনেতা পঞ্চু সেনের বাড়ি। পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন সিগন্যাল পেয়েও কেন আপনার গাড়ি থামল না? জবাবে পঞ্চু সেন বললেন, 'নবাব সিরাজউদ্দৌলার গাড়ি কোনও পুলিশ অফিসার থামাতে বলতে পারেন না; গতরাতে ঐ গাড়িতে পঞ্চু সেন ছিলেন না, ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা!'

দর্শক-শ্রোতাদের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে ছিল ঈর্ষণীয়। কোন্ অভিনেতার হাসিটি কান্নায় পরিণত হতে গিয়ে বেশি গলা ধরে গিয়েছিল, কোন অভিনেতার প্রবেশে পা সঠিক মাপে পড়েনি, কোন অভিনেতার পোশাক কতটা মার্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল এসব চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন দর্শক-

শ্রোতারা। অভিনয়ের মান খারাপ হলে চিৎকার-চেঁচামেচি করে শিল্পীদের বা অভিনেতাদের পুনরায় গ্রিনরুমে ফেরতও পাঠিয়েছে দর্শক-শ্রোতারা।

যাত্রাশিল্পী ও দর্শক-শ্রোতা: বর্তমান

পেশাগত হলেও 'অভিনয়ের জন্য অভিনয় জন্য' হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের যাত্রাশিল্পীদের মানসিকতা। অভিনয়ের মাধ্যমে যেটুকু নৈপুণ্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন একজন অভিনেতা, সেটা কেবলই পেশাটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। অভিনয়ে প্রাজ্ঞতার একেবারে অনুপস্থিত ঘটলে মালিকপক্ষ চাকরি খুইয়ে দিতে পারেন কেবলই সেই ভয়টুকুর বদৌলতে এখনও এ মাধ্যমের শিল্পীরা টিকে আছেন। পেশাগত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে নতুন মাত্রা যোগ করতে হবে অভিনয় কুশলতায় সে চিন্তা যেন শিল্পীদের চেতনায় আজ আর নেই। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যায়।

যশোরের মণিরামপুর এলাকার জনৈক লংকেশ্বর গাইনের কথা বলি। লংকেশ্বরের ভূমিকা এল মঞ্চে আজান দেবার। পেশায় কৃষক এই ছেলেটি ছুটতে থাকল পাশের বিভিন্ন গ্রামের মোয়জ্জিনের কাছে। রাত-বিরেতে সেইসব মোয়জ্জিনদের সে একপ্রকার বিরক্ত করেই তুলল তার আজান শেখার প্রচেষ্টায়। মাঠ থেকে কাজ করে ফেরার সময় বিলের ভিতর কোথাও উঁচু জায়গা পেলেই হাতের কাস্তে বা মাথার টোপা ফেলে দিয়েই সেই স্থানে উঠে দুইকানে আঙুল দিয়ে আজান দিতে শুরু করত। এই আজান তার কণ্ঠে এতটাই মধুরতা পেয়েছিল যে, ব্রজেন দে রচিত ঐতিহাসিক যাত্রাপালা *বাঙালী* বইয়ের শেষ দৃশ্য গ্রিনরুম থেকে ভেসে আসা সুবহে-সাদেকের আজান ধ্বনি বহু মুসল্লির মন কেড়েছিল। অনেক মুসলমান শ্রোতা সেই আজান ধ্বনি শুনে মন্তব্য করেছিলেন এ আজানের ধ্বনি কোনও হিন্দু অভিনেতার কণ্ঠের হতেই পারে না! অভিনেতাদের অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠার এ একটি উদাহরণ।

অবশ্য বিভিন্ন মঞ্চে আজও দু'একজন জাত অভিনেতার দেখা মেলে। কিন্তু তা একেবারে হাতেগোনা মাত্র। আমাদের আলোচনা সামগ্রিকতা নিয়ে; ব্যতিক্রম নিয়ে নয়। আজকের দিনের যাত্রাশিল্পী তার অভিনয়শৈলীর চেয়ে অর্থের প্রতি বেশি মনোযোগী। একটি চরিত্রকে সঠিকভাবে রূপায়নের জন্য তার যত না চেষ্টা, তার চেয়ে বেশি চেষ্টা তার অর্থ আয়ের দিকে। তারপর এ পেশাটা একবারেই ঋতুকালীন (সিজিন্যাল)। বর্ষার মরশুমে যাত্রামঞ্চায়ন হয় না বললেই চলে। এই সময়টায় তাকে আয়ের অন্য কোনও পথে ঝুঁকে পড়তে হয়। হতে পারে সেটি কৃষি, হতে পারে সেটি ব্যবসা। ফলে পেশাগত অখণ্ড মনযোগও তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না।

অভিনয় প্রস্ফুটিত হবে দর্শক-শ্রোতার চাহিদার ভিত্তিতে। আজকের দর্শক-শ্রোতারাও দায়সারা গোছের। দল জুটে প্যান্ডেলে প্রবেশ করে দুই-তিন অঙ্ক পেরুতে না পেরুতেই আবার দলবদ্ধ হয়ে হুড়মুড় করে প্যান্ডেল ছেড়ে ছুটে পালাল। মনোনিবেশ নষ্ট হল পাশের শ্রোতার আর গ্রিনরুম থেকে কষ্ট পেলেন অভিনেতারা। তারা ভাবলেন, তাদের অভিনয় কী এতই মন্দ লাগছে যে, দলবেঁধে সবাই হুড়মুড় করে উঠে গেল! যাত্রার সঙ্গে অশ্লীল নৃত্য ইত্যাদি যুক্ত হয়ে পড়ায় অভিনয় বাদ দিয়ে নৃত্যের জন্যও দর্শকদের হট্টগোল করতে দেখা যায়।

লোকশিক্ষা ও সর্বজনীনতা

যাত্রাপালা লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে আমাদের দেশে বিবেচিত। খেটে খাওয়া মানুষ থেকে গবেষক, নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত, নারী-শিশু-কিশোর-বৃদ্ধসহ সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষ এই যাত্রাপালার দর্শক-শ্রোতা। বিশেষত নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত-অর্ধ শিক্ষিত মানুষেরাই বেশি ঝুঁকে পড়েন বিনোদনের সঙ্গে লোকশিক্ষার এ মাধ্যমটিতে। সব পালায়ই থাকে কিছু শিক্ষণীয় বিষয়, থাকে মহানুভবতার বার্তা।এই বার্তা ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সর্বস্তরের মানুষের জ্ঞানকে প্রসারিত করে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'নাটকে নোক শিক্ষে হয়'। তিনি নিজে বাগবাজারে গিরিশ ঘোষের মঞ্চের শ্রোতা হতেন। বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জনচেতনামূলক যাত্রাপালা রচনা করেছিলেন। সেই যাত্রাপালা তৎকালীন সময়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে যথেষ্ট কাজে লেগেছিল। একইভাবে সামাজিক সমস্যার আবর্তে রচিত *পালা মা মাটি মানুষ*, *অচল পয়সা*; রাজনৈতিক জনজাগরণমূলক পালা *লেলিন*, *হিটলার*, *আমি সুভাষ বলছি*, *স্পার্টাকাস* প্রভৃতি লোকশিক্ষা জনচেতনার উপাদানে সমৃদ্ধ। ধনী-নির্ধনের অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক রীতি বিরোধীদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ, মজুতদার ও অতি মুনাফা লোভীদের চিহ্নিতকরণ, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামময় জীবন, নারী শিক্ষার বৈপ্লবিক ও সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ও স্থান পাচ্ছে যাত্রাপালায়। দর্শক-শ্রোতারা বিষয়গুলি আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছে এবং শিক্ষা গ্রহণ করছে।

যাত্রাশিল্পে বাংলাদেশ ও ভারত

ভারতের যাত্রার আঙ্গিক ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের চেয়ে কিছুটা হলেও ভিন্ন। যেমন বাংলাদেশের যাত্রাপালা শুরু হয় রাত্রি এগারোটায় এবং নাচ ও কৌতুক অভিনেতার সংলাপের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির চালনার মাঝে ভোর চারটা বা সাড়ে চারটায় শেষ হয়। এই ভোর চারটা বা সাড়ে চারটায় যাত্রাপালা শেষ করার জন্য কমিটির তাগিদও থাকে। এর আগে শেষ হলে যানবাহনহীন রাস্তায় দর্শক-শ্রোতারা বাড়ি পৌঁছাতে পারেন না। শ্রোতাদের দিকটা বিবেচনা করে এই ভোররাত্রে যাত্রাপালা শেষ করা হয়। সারারাত্রি জাগরণের এই ধকলে দর্শক-শ্রোতা আর পরের দিন তার কর্মস্থলে প্রযুক্ত হতে চান না বা পারেন না।

ভারতের যাত্রাপালা রাত্রি আটটা কিংবা সাড়ে আটটায় শুরু হয়ে সাড়ে এগারোটা কিংবা বারোটায় শেষ হয়। যাত্রাপালার স্থান রেললাইন সংলগ্ন হলে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত যাতে রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে, কর্তৃপক্ষ সেইমত ব্যবস্থা করেন। বাস লাইন সংলগ্ন হলে বাস ঐ রাত্রি পর্যন্ত অর্থাৎ যাত্রাপালা শেষ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে কর্তৃপক্ষ তেমনই ব্যবস্থা রাখেন। এর পর ঐ দর্শক-শ্রোতা বাড়ি গিয়ে তিন-চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে পরদিন কর্মক্ষেত্রে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন।

যদি অভিনেতারা পরপরই মঞ্চে আসেন অর্থাৎ দৃশ্যের বা অঙ্কের মাঝে কোন বিরতি সৃষ্টি না করেন তবে পালাটি শেষ হতে তিন বা সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগবে এমন করেই রচনা করা হয় যাত্রাপালা। ভারতের যাত্রাভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের কেবলমাত্র ঐ যাত্রাপালার চরিত্রের সজ্জা অনুযায়ী মঞ্চেই দেখা হয়। বছর সত্তর আগে থেকে অপেরা পার্টিগুলি নিজেদের যানবাহনে করেই সময়মত মঞ্চেই উপস্থিত হন। এই যানবাহনটি মূলত বাসগাড়ি। অভিনেতারা চলমান গাড়িতে নিজের আসনে বসেই সাজ-সজ্জা করতে থাকেন এবং পালা শুরুর সময়ের কিছু পূর্বে গ্রিনরুমে উপস্থিত হয়ে সময়মত মঞ্চে আসেন। কোনও কোনও অপেরা পার্টিতে মূকাভিনয় বা পালার বাইরে কৌতুকাভিনেতা দশ-পনের মিনিট সময়ে উপভোগ্য কিছু রসাল বিষয় উপস্থাপন করেন। তবে বেশিরভাগ অপেরা পার্টিতে এসব বিষয় থাকে না। কেবলমাত্র মঞ্চায়নের জন্য নির্দেশিত পালাটিই মঞ্চস্থ করেন এবং পালা শেষে বাসে চড়ে চলে যান গন্তব্যে। কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করলেন, লিফলেট পড়া ব্যতীত তাদের চেনা মুশকিল। অনেক যাত্রাদল বা অপেরাপার্টি চরিত্রের প্রয়োজনে জীব-জন্তুও মঞ্চে উপস্থাপন করে। *আমি সুভাষ বলছি* যাত্রাপালার নাম ভূমিকায় একসময় অভিনয় করতেন শান্তি গোপাল। তিনি নেতাজী সুভাষ বসুর পোশাকে জীবন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে মঞ্চে আসতেন। সাজ-সজ্জার মাঝে সমস্ত অভিনেতাকে মালুম করতে না পারলেও চলা-বলা দেখেই বিখ্যাত অভিনেতাদের উপস্থিতি প্রায় সকল দর্শক-শ্রোতাই আঁচ করতে পারেন। একটি অপেরা কোম্পানি ব্যবসায়িক কারণে খুব নামকরা অভিনেতা বেশি রাখতে পারেন না। তবু যাত্রার শিল্পসম্মত রূপটি এখনও সেখানে দেখা যায়।

অন্যদিকে বাংলাদেশে যাত্রার শিল্পগুণ ধ্বংস হয়েছে অশ্লীল নৃত্যের কারণে। সাধারণভাবে এই নর্তকীদের বলা হয় 'এক ঝাঁক ডানাকাটা পরী'। প্রচারের সময় এই নর্তকীদের কথাই বেশি ফলাও করে বলা হয়। এই নর্তকীরা প্রায় কাপড়বিহীন শরীরে মঞ্চে আসে, নগ্নতা প্রদর্শন করাই এ নাচের মূল উদ্দেশ্য। এই অশ্লীল প্রবণতার কারণে বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প থেকে রুচিশীল মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে যাত্রাশিল্পটি অনেকটা মরার মত করে বেঁচে আছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে এ অধঃযাত্রার লাগাম টেনে ধরতে হবে, তবেই নবজীবন লাভ করবে বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প তথা যাত্রাপালা।

অরবিন্দ মণ্ডল প্রাবন্ধিক, গবেষক

প্রবন্ধ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
এ ক প্র হে লি কা র না ম

পরমা

আট-নয় বছর বয়েসে গ্রামেই মধুসূদনকে ফার্সি শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। মধুসূদন দ্রুত এই ভাষা শিখে নেন। সেই সঙ্গে গজল শেখেন। পরে হিন্দু কলেজের বন্ধুদের তিনি গজল শোনাতেন। ১৮৪১ সালের শেষ দিকে হিন্দু কলেজে মধুসূদন একটি হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। যা টিকে ছিল তিন থেকে চার মাস। হিন্দু কলেজে বাংলা পড়াতেন রামতনু লাহিড়ী। তাঁর পটলডাঙ্গার বাড়িতে মধুসূদনসহ অন্য ছাত্ররা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এই আড্ডাতেই মধুসূদন অনর্গল মিল্টন ও শেক্সপিয়র থেকে আবৃত্তি করতেন। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার আগে হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় মধুসূদন পেয়েছিলেন পঞ্চাশের মধ্যে তিরিশ। তিনি অষ্টম হয়েছিলেন। প্রথম হয়েছিলেন গোবিন্দ দত্ত, তিনি পেয়েছিলেন ঊনপঞ্চাশ। দ্বিতীয় হয়েছিলেন প্যারীচরণ সরকার। পেয়েছিলেন সাতচল্লিশ। ধর্মান্তরের সন্ধ্যায় চার্চে গাইবার জন্য মধু নিজেই একটি হিম রচনা করেছিলেন। *মেঘনাদবধ কাব্য* উৎসর্গ করেছিলেন দিগম্বর মিত্রকে। তিনি মধুসূদনকে বিদেশে প্রতিশ্রুতিমত টাকা পাঠাননি, ফলে মধুসূদন বিপদে পড়েছিলেন।

নতুন স্কুলজীবন তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিল অন্য সংকট। বালকটি স্কুলের অন্য ছাত্রদের মত ইংরেজিতে কথা বলতে তো পারত না, বরং উদ্ভট যশুরে বাংলায় কী যে বলত! তা নিয়ে সহপাঠীদের হাসির খোরাক হত। আত্মরক্ষার জন্য মধু ধরেছিলেন ভিন্ন পথ। তাঁর পিতা যে ধনী উকিল রাজনারায়ণ দত্ত– এ কথা তিনি মাঝে মাঝেই বলতে শুরু করেন। দামি উপহার দিতেন, বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। বড়লোকী চাল দেখিয়ে হীনমন্যতা থেকে রেহাই পেতে চাইতেন। বাল্য-কৈশোরে যা ছিল আত্মরক্ষার অস্ত্র, শেষ পর্যন্ত সেটাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অভ্যাসে।

ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন *গ্রেজ ইন কলেজ*-এ। সেখানে ভর্তির রেজিস্টারে নিজের বয়স লিখেছিলেন ৩১। অথচ তাঁর তখন বয়স ছিল ৩৮।

মাদ্রাজ থেকে মাইকেল কলকাতা চলে আসেন মিস্টার হোল্ট ছদ্মনামে। সকলের ধারণা, রেবেকার চোখে ধুলো দিতে তিনি এই নাম নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে এই নামে ঠাট্টা করে ডেকেছিলেন জাহাজের কর্মীরা এবং তারাই রিপোর্টে মধুসূদনের নাম মিস্টার হোল্ট করে দিয়েছিলেন।

১৮৭২ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাসে মাইকেল পুরুলিয়া যান একটি মামলার কারণে। বরাকর থেকে পুরুলিয়া ৪২ মাইল পথ তাঁকে পালকিতে যেতে হয়। যাত্রা পথে দেখেছিলেন পরেশনাথ পাহাড়। একটি সনেটে এই পাহাড়ের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

খিদিরপুরের রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন তমলুকের রাজপরিবারের উকিল। একবার একটা মামলার সূত্র ধরে তাঁকে যেতে হবে তমলুকে। পুজোর সময় যাওয়া। বিশেষ একটি ঘটনায় একমাত্র পুত্র মধুর সঙ্গে তখন তাঁর বিবাদ চলছে। রাজনারায়ণ এতটাই বিরক্ত যে পুত্রকে বলে দিয়েছেন তাঁকে এবার গ্রামের বাড়ি সাগরদাঁড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। উদ্বিগ্ন পিতা ছেলেকে তাঁর কলকাতার বন্ধুদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন এতেই মধুর 'রোগ' সেরে যাবে। যে-রাতে মধুকে যশোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়েছিল, সে দিন সকালে মনমরা মধুসূদন প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছিলেন, 'আমি যদি একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারতাম! কিন্তু আমাকে তা নিষেধ করা হয়েছে! প্রিয়, প্রিয় গৌর– প্রিয়তম বন্ধু! আমাকে ভুলে যেয়ো না!'

কিন্তু রাজনারায়ণ মধুর মায়ের কথা ফেলতে পারলেন না। সামনেই ছিল ছেলের পরীক্ষা। সে সময় গ্রামের বাড়িতে চলে গেলে মধুর লেখাপড়ার ক্ষতি হবে খুব– জাহ্নবীদেবী স্বামীকে বোঝাতে সমর্থ হলেন বলে মধুসূদন এত বড় ভাবি বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন।

সেপ্টেম্বরের ১৯ থেকে কলেজে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবার কথা। ২৮ তারিখ শেষ। মধু ও গৌর পরীক্ষা দিতে দিতেও আশঙ্কা করেছিলেন বোধহয় ২৮-এর পরে যেতে হবে যশোর, কেন-না, বাবা কিছুই উচ্চবাচ্য করছেন না এ নিয়ে। অবশেষে অক্টোবরের সাত তারিখে জানা গেল, যশোরে যেতে হচ্ছে না। তার বদলে যেতে হবে তমলুকে।

কলকাতায় রাজনারায়ণ দত্ত উকিল হিসেবে তখন একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। তাঁর ওই একটি মাত্র ছেলে। ভাল ছাত্র। স্কলারশিপ পেয়েছে। ইংরেজিতে তুখোড়। ডেপুটি হবার সব রকম যোগ্যতা তাঁর ছিল। কিন্তু মাঝে মধ্যেই এই আদুরে ছেলে আজব সব আচরণ করত। ছেলের সমস্যা তিনি বুঝতে পারেননি। আর পাঁচটা বাপের মত করে তো তিনি ছেলের সঙ্গে মিশতেন না। বরং তাঁকে বন্ধু করে নেওয়ার চেষ্টাই করেন। এমনকী মধুর বন্ধুরা পর্যন্ত এই সময়ের শিক্ষিত ছেলেপুলে হয়েও পিতা-পুত্রের এমন সহজ সম্পর্ককে উদার মনে মেনে নিতে পারতেন না।

কিছুদিন আগে তাঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিলেন গৌরদাস আর ভোলানাথ। এই প্রথম তাঁরা খিদিরপুরের বাড়িতে এসেছিলেন। হিন্দু কলেজের এই দুই ছাত্র সেজেগুজে মধুদের বাড়িতে এসে দেখেন, এ কী কাণ্ড! রাজনারায়ণ দত্ত আলবোলা টানছেন। তাঁর টানা শেষ হবার পরে তিনি নলটা এগিয়ে দিলেন মধুর দিকে। মধুও বেশ তৃপ্তির সঙ্গে তামাকের ধোঁয়া ছাড়ছেন। বিস্মিত গৌরদাস বন্ধুর কাছে এই বিষয়ে জানতে চাইলে মধুসুদন তাকে আরও হতবাক করে দিয়ে বলেছিলেন, তাঁর পিতা এ সব বস্তাপচা নিয়মনীতির তোয়াক্কা তো করেনই না, এমনকী তাঁরা কখনও কখনও একসঙ্গে বসে মদ্যপানও করেন। বাপ হয়ে ছেলেকে এত বন্ধুত্ব দেবার পরেও মধুসূদনের এমন উদ্ভট আচরণের কোনও ব্যাখ্যা পাননি। তাই রাজনারায়ণ ঠিক করেছিলেন এবারে তমলুকে গিয়ে তিনি কাছ থেকে মধুকে দেখবেন, সমস্যাটা ঠিক কোথায় বোঝার চেষ্টা করবেন।

১০ই অক্টোবর সপ্তমী পুজোর দিন রাজনারায়ণ নৌকো করে তমলুক যাত্রা করলেন। পৌঁছলেন ১২ তারিখ। রাজবাড়িতে নবমী পুজোর হইচই। চারপাশে যেন মেলা বসেছিল। বিজয়ার শেষে হট্টগোল একটু মিটে গেলেও ১৯শে অক্টোবর বুধবারে শুরু হল লক্ষ্মীপুজোর ব্যস্ততা।

রাজবাড়ি বলে কথা! কোনওকিছুই ছোট আয়োজনে হয় না। রাজনারায়ণ ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময়টুকুও পাননি। ধনী মক্কেলের পারিবারিক মজলিশেই তাঁকে সময় কাটাতে হয়েছিল। তিনি জানতেও পারেননি, তাঁর আঠারো বছরের পুত্র সেখানে গিয়ে প্রেমে পড়ে গিয়েছে। পাত্রীটি ছিলেন জনৈকা বিধবা। কেউ কেউ বলেন বিধবা নয়, বিবাহিতা এক রমণী।

সতেরো দিনের এই তমলুক বাসে, এক রাতে, গৌরদাসকে মধু লিখেছিলেন, 'এখানে আমার একটা ছোটখাটো প্রেমের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছো, বিবাগী এবং সন্ন্যাসী থেকে রাতারাতি একটা লম্পটে পরিণত হয়েছি।'

জীবনীকারেরা বলেন, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা দেবকীর প্রতি আজীবন প্রেমমুগ্ধ ছিলেন মধুসূদন। তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছাতেই তিনি 'খ্রিস্টান' হয়ে যান। এটার সত্যতা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ ও বিতর্ক আছে। কারণ মধুসূদন যখন খ্রিস্টান হলেন তখন দেবকীর বয়স মাত্রই পাঁচ বছর।

মধুর যখন দশ বছর বয়স, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। তার আগে মধুসূদন ছিলেন কলকাতা থেকে দূরে যশোরের সাগরদাঁড়ি নামে এক অজগাঁয়ের বালক। গ্রাম থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়লেন শহরে, প্রাথমিক উচ্ছ্বাস ও কৌতূহল কেটে গেল স্কুলে ভর্তি হবার আগেই। উপরন্তু, নতুন স্কুলজীবন তাঁর জীবনে নিয়ে এসেছিল অন্য সংকট। বালকটি স্কুলের অন্য ছাত্রদের মত ইংরেজিতে কথা বলতে তো পারত না, বরং উদ্ভট যশুরে বাংলায় কী যে বলত! তা নিয়ে সহপাঠীদের হাসির খোরাক হত। আত্মরক্ষার জন্য মধু ধরেছিলেন ভিন্ন পথ। তাঁর পিতা যে ধনী উকিল রাজনারায়ণ দত্ত– এ কথা তিনি মাঝে মাঝেই বলতে শুরু করেন। দামি উপহার দিতেন, বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। বড়লোকী চাল দেখিয়ে হীনমন্যতা থেকে রেহাই পেতে চাইতেন। বাল্য-কৈশোরে যা ছিল আত্মরক্ষার অস্ত্র, শেষ পর্যন্ত সেটাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অভ্যাসে। অকারণে অহংকারী হয়ে ওঠা, বাড়িয়ে বলা। এই অভ্যাসেই তিনি যখন কলকাতা থেকে 'লেডি স্টাইল' জাহাজে করে মাদ্রাজ যাত্রা করেন, যাত্রীদের নামের তালিকায় মধুসূদন নিজেই লিখেছিলেন, 'মি এম এম ডাট অফ বিশপস কলেজ'। জাহাজের সমস্ত শ্বেতাঙ্গ যাত্রীর মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র

কৃষ্ণাঙ্গ, তবু তিনি যে ফেলনা নন, তা জানানোর উদ্দেশ্যেই 'বিশপস কলেজ' অংশটুকু জুড়ে দেওয়া।

আবার মাদ্রাজে রেবেকাকে বিয়ে করার সময় চার্চের রেজিস্টারে মধু পিতৃপরিচয় লিখেছিলেন 'সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট'। অথচ রাজনারায়ণ দত্ত আদৌ অ্যাডভোকেট ছিলেন না। কলকাতায় তখন যে প্রায় চারশো প্লিডার-উকিল ছিলেন, রাজনারায়ণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বিধবার সঙ্গে প্রেমের সংবাদটি রাজনারায়ণ নিশ্চয়ই পাননি। কিন্তু মধুসূদনের 'মনে'র সমস্যাটি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন তমলুকে বসেই। তাই রাজনারায়ণ ঠিক করলেন, পুত্রের বিয়ে দেবেন। মেয়েটি ছিল এক জমিদার-কন্যা। পরীর মত তাঁর রূপ ছিল বলে কথিত। তবে মেয়েটি যে কে, তা জানা যায় না।

তখন মধুর বন্ধু গৌরদাস আর ভূদেবের বিবাহ হয়ে গেছে। পাশের বাড়ির রঙ্গলালের বিবাহ হয়েছিল মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে। সেখানে মধু তখন উনিশ। তবু মধু বেঁকে বসলেন। এই বিবাহ তিনি কিছুতেই করবেন না। কেন-না ভালবেসে বিয়ে করার আদর্শকে তিনি মনের গভীরে এমন শিকড় চারিয়ে দিয়েছিলেন যে সেখান থেকে হঠাৎ এই বিবাহ-প্রস্তাব তাঁর কাছে বজ্রপাতের মত ছিল। গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে মধুসূদন লিখেছিলেন, 'এখন থেকে তিন মাস পরে আমায় বিয়ে করতে হবে– কী ভয়ানক ব্যাপার। এটা ভাবলেও আমার রক্ত শুকিয়ে যায় এবং আমার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে ওঠে। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা, সে হল এক ধনী জমিদারের কন্যা। হতভাগিনী মেয়ে। অজ্ঞাত ভবিষ্যতের গর্ভে তার জন্যে কী দুঃখই যে জমা আছে!'

কী করবেন মধুসূদন?

হিতাহিত না ভেবেই স্থির করে ফেললেন মুক্তির উপায়। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। তাতে কোনও হিন্দু পিতা তাঁর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবেন না। তাই বালিকা-বধূর পাণিগ্রহণ তাঁকে আর কোনও দিনই করতে হবে না। খিদিরপুরের বাড়িতে তিনি আর থাকতে পারবেন না, এমনকী ওই পাড়াতেও কেউ তাঁকে বাড়ি ভাড়া দেবে না, সাধের হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, প্রিয় বন্ধুরা কেউ কেউ সংস্পর্শ ত্যাগ করবে তবু মধুসূদনের চিন্তার স্রোতে এ সব কণামাত্র তরঙ্গ তুলল না।

তবে খ্রিস্টান হবার শর্ত হিসেবে মিশনারিদের কাছে তিনি দাবি করেছিলেন– তাঁকে বিলেত পাঠানো হোক। সে-শর্তে রাজি হয়ে গেলেন চার্চের কর্তৃপক্ষ। খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা নেবার তারিখ ঠিক হয়েছিল ৯ই ফেব্রুয়ারি। ২রা ফেব্রুয়ারি মধূসুদন এক মোহরের বিনিময়ে ফিরিঙ্গি-ধাঁচের চুল ছাঁটিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে এসে বন্ধু ভূদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– 'বলো কেমন হয়েছে আমার চুলের নতুন ছাঁট?' ভূদেবের ভাল লাগেনি। মধু ঝগড়া করেননি। কারণ একমাত্র তিনিই জানতেন যে আর কিছুদিন পরে তিনি খ্রিস্টান হবেন, বিলেতেও যাবেন, তাই এমন সাজসজ্জা।

৩রা ফেব্রুয়ারি মধু বাড়ি থেকে উধাও হলেন। পরিচিতদের মধ্যে শেষবার তাঁকে দেখেছিলেন দিগম্বর মিত্রের ছোট ভাই মাধব মিত্র। তবে দুই দিন পর মধুর খোঁজ মিলেছিল। তিনি ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের একজন নামী উকিলের পুত্র এবং হিন্দু কলেজের অন্যতম সেরা ছাত্রকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হবে– মিশনারিদের কাছে এটা একটা বড় জয় ছিল। কিন্তু রাজনারায়ণ যদি লাঠিয়াল পাঠান মধুকে কেড়ে নেবার জন্য? তাই দুর্গে লুকিয়ে রাখার ফন্দি করা হয়েছিল। কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারছিলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা করতে পারেন মধুর জ্যাঠতুতো ভাই প্যারীমোহন, হিন্দু কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র এবং বন্ধু গৌরদাস বসাক। তাঁরা অনেক বুঝিয়েছিলেন।কিন্তু মধু সিদ্ধান্তে অনড়।

৯ই ফেব্রুয়ারি সন্ধেবেলায় ওল্ড চার্চে 'মাইকেল' হয়ে গেলেন মধুসূদন দত্ত। প্রায় ছ'বছর কেটে যাবার পরে মধু বুঝেছিলেন সমাজের মার কাকে বলে! হিন্দু কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু থাকতে পারেননি। রাজনারায়ণ মনে মনে ভেবেছিলেন কিছুদিন যাক, প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ছেলেকে আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনবেন। এতকিছুর মধ্যেও মধু পড়াশুনোটা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তাই বিশপস কলেজে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। খরচপত্র রাজনারায়ণই দিচ্ছিলেন, যদিও বাপ-ছেলের মধ্যে অশান্তি লেগেই ছিল। ক'দিন বাদে তারই জেরে কলেজের শেষ বছরের পরীক্ষায় বসতে পারেননি মধুসূদন। বাবা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে কলেজ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে।

১৮৪৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি, মঙ্গলবার, 'লেডি সেইল' নামের জাহাজটি মাদ্রাজে পৌঁছেছিল। জাহাজ থেকে নেমেছিলেন 'মাইকেল মধুসূদন ডাট'। বিশপস কলেজের সহপাঠী এডবার্গ কেনেটের দাক্ষিণ্যে শিক্ষকতার চাকরি জুটেছিল অরফ্যান অ্যাসাইলাম বয়েজ স্কুলে। নামে বয়েজ স্কুল হলেও সেখানে ফিমেল অরফ্যান অ্যাসাইলামের মেয়েরাও পড়তেন। 'রেবেকা ম্যাকটাভিশ' থাকতেন ফিমেল অ্যাসাইলামে, পড়াশুনো করতেন অরফ্যানের বয়েজ স্কুলে। মাইকেল ছাত্রী হিসেবে সেখানেই রেবেকাকে পান। শিক্ষক মধুসূদন সকলের নজর কেড়েছিলেন এবং কলেজের বার্ষিক প্রতিবেদনে তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছিল। নীলনয়না শ্বেতাঙ্গিনী রেবেকার সঙ্গে তাঁর প্রণয় এবং পরিণামে পরিণয় হয়ে গিয়েছিল মাত্র ছ'মাসের মধ্যে, যদিও তাতে বাধাও ছিল প্রচুর।

ওদিকে রেবেকার পিতৃ-পরিচয় ছিল রহস্যে ঘেরা। তাঁর পিতার নাম ছিল রবার্ট টমসন, মা ক্যাথরিন টমসন। রবার্টের মৃত্যুর পর ক্যাথরিন আশ্রয় পেয়েছিলেন ডুগাল্ড ম্যাকটাভিশের কাছে এবং এই পালক পিতা ম্যাকটাভিশের নামকেই রেবেকা নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করে নেন। অথচ রেবেকাকে থাকতে হয়েছিল অরফ্যান অ্যাসাইলামে! তা হলে? রেবেকা কি অনাথ ছিলেন?

বিয়ের সাড়ে তিন মাসের মাথায় রেবেকা গর্ভবতী হলেন। সংসারে যথেষ্ট অভাব। সামান্য বেতনে আর চলে না। এমন পরিবেশে কাব্যচর্চা সহজ নয়। তবু এরই মধ্যে মাইকেল *ম্যাদ্রাস সার্কুলার* পত্রিকার জন্য *ক্যাপটিভ লেডি* কাব্যটি লিখে ফেললেন। ধার-দেনা করে বই ছাপিয়ে কলকাতায় পাঠালেন। বুকে আশা, কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজ এই বই গ্রহণ করবে। তাকে কবি বলে প্রতিষ্ঠা দেবে। কার্যত বইটি বিক্রি হয়েছিল মাত্র ১৮ কপি। এমনকী *বেঙ্গল হরকরা* পত্রিকায় মাইকেলকে তীব্র আক্রমণ করে রিভিউ লেখা হয়েছিল, যেখানে ব্যক্তি মাইকেলকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলেছিলেন সমালোচক। বেথুন সাহেবও কাব্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেননি, বরং লিখেছিলেন, '...ইংরেজি চর্চার মাধ্যমে তিনি যে রুচি এবং মেধা অর্জন করেছেন, তা তাঁর নিজের ভাষার মানোন্নয়ন এবং কাব্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যয় করুন।'

এর পর মাইকেলের কবিখ্যাতি মাদ্রাজ শহরে আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, 'রিজিয়া' লিখেছিলেন (সম্পূর্ণ করেননি)। প্রথমে *ইউরেশিয়ান*, পরে একযোগে *ইস্টার্ন গার্ডিয়ান* ও *মাদ্রাজ হিন্দু ক্রনিকল* সম্পাদনা করেছিলেন, গ্রিক-ল্যাটিন-হিব্রু-সংস্কৃত-ইংরেজি অধ্যয়ন করেছিলেন একদম রুটিন মেনে।

ওদিকে সন্তানের জন্মের পর রেবেকার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় রেবেকা সন্তানকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন নাগপুরের দিকে। এই প্রথম রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের একটানা দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদ হয়েছিল। সন্তানকে কাছে না পাওয়ার যন্ত্রণা তো ছিলই– সেইসব কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন মাইকেল *অন দ্য ডিপারচার অফ মাই ওয়াইফ অ্যান্ড চাইল্ড টু দ্য আপার প্রভিন্সেস* নামে একটি কবিতায় 'মাই হোম ইজ লোনলি– ফর আই সিক ইন ভেন ফর দেম হু মেড ইটস স্টার-লাইট।

পরের বছরের গোড়ায় মাইকেলের মা মারা যান। 'সুদূর' মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় যাওয়ার মত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও ঝটিকা সফরে তিনি কলকাতায় এসে বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। জাহ্নবী দেবীর এই অকাল মৃত্যুর জন্য রাজনারায়ণ মাইকেলকেই দায়ী করেছিলেন। মধু তাঁর পিতার মুখের ওপর বলতে পারেননি– এই মৃত্যুর জন্য রাজনারায়ণ নিজেও কম দায়ী নন। পুত্রসন্তানের আশায় তিনি আরও তিনটি বিবাহ করেছিলেন যা কম আহত করেনি জাহ্নবীকে।

নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে রেবেকার গর্ভে মাইকেলের চারটি সন্তানের জন্ম হয়েছিল– ব্যর্থা, ফিবি, জর্জ ও জেমস। দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে। 'চমৎকার স্ত্রী এবং চারটি সন্তানের' সংসার যখন তিনি বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে বসছেন, তখন ১৮৫৫ লালের ১৯শে ডিসেম্বর বুধবারে গৌরদাসের লেখা একটি চিঠি থেকে তিনি জানতে পারেন বাবা রাজনারায়ণ দত্ত মারা গেছেন অন্তত এগারো মাস আগে– 'সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তোমার জ্ঞাতি ভাইয়েরা কাড়াকাড়ি করছে। তোমার দুই বিধবা মাতা বেঁচে আছেন। কিন্তু

তোমার লোভী এবং স্বার্থপর আত্মীয়দের বাড়াবাড়ির জন্য তাঁরা তাঁদের মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে প্রায় বঞ্চিত হয়েছেন।'

সম্পত্তি উদ্ধারের আশা আছে জানতে পেরে মাইকেল কলকাতা যাবেন মনস্থির করে ফেললেন। রেবেকা যখন স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় উত্তরে ভ্রমণ করতে গেছিলেন, তখনই মাইকেলের সহকর্মী জর্জ জাইলস হোয়াইটের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল। জর্জের তিন সন্তান ছিল– বড় মেয়ে হেনরিয়েটা, ছোট দুটি ছেলে উইলিয়াম ও আর্থার। নিজের মাকে হারিয়ে মাইকেল জানতেন যে জীবনে মাতৃবিয়োগের ব্যথা কতটা আহত করে, সহকর্মীর এই তিন সন্তানকে তিনি তাই বাড়তি সঙ্গ দিয়েছিলেন স্বাভাবিক কারণেই। স্ত্রী-বিয়োগের তিন বছর পরে জর্জ হোয়াইট দ্বিতীয়বার বিবাহ করে ফেলেছিলেন ষোল বছর বয়েসি এমিলি জেইন শর্ট নামে এক কিশোরীকে। জর্জের বয়স তখন ছিল সাতচল্লিশ। হেনরিয়েটা তখন ছিলেন সতেরো, নতুন মা ও নববধূর থেকে এক বছরের বড়। ফলে হোয়াইট পরিবারে ঝড় উঠল। বিমাতার সঙ্গে হেনরিয়েটার পদে পদে অশান্তি শুরু হল– মাইকেল সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে হেনরিয়েটার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হল।

পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মাইকেল যখন কলকাতা যাবেন ঠিক করে ফেললেন, তার কিছুদিন আগে তাঁর 'সুখের নীড়ে' ভয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গিয়েছিল। হেনরিয়েটার সঙ্গে মাইকেলের প্রেম প্লেটোনিক ছিল না। একাধিক বার তাঁদের মিলন হয়েছিল। মাইকেল দিব্য একটি দ্বৈত সম্পর্ক চালাচ্ছিলেন– রেবেকার সঙ্গে দাম্পত্য, হেনরিয়েটার সঙ্গে প্রেম। হেনরিয়েটা মাইকেলের সাহিত্যসঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর সঙ্গ কবি পছন্দ করতেন, তুলনায় অর্ধশিক্ষিত রেবেকা ছিলেন কবির নির্ভরতার সঙ্গী। কবি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, রেবেকা সহস্র বাধা অগ্রাহ্য করে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে মাইকেলকে বিয়ে করেছিলেন। হেনরিয়েটা যদি মাইকেলকে বিয়ের ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেও থাকেন, স্পষ্টবাক মাইকেল নিশ্চয়ই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন রেবেকাকে ডিভোর্স দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

ওদিকে রেবেকা জানতে পেরে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর নতুন প্রেমের কথা। অনুমান করা যেতে পারে, রেবেকা স্বচক্ষে, অথবা তাঁদের সন্তানদের মধ্যে কেউ একজন মাইকেল-হেনরিয়েটাকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন। এর পর পালিয়ে যাওয়া ছাড়া মধুসূদনের পক্ষে গত্যন্তর ছিল না।

কলকাতায় পালিয়ে এলেন মাইকেল। আর কোনও দিন ফিরে যাননি রেবেকার কাছে, সন্তানদের কাছে। রেবেকা তাঁকে বিবাহ-বিচ্ছেদ দেননি। হেনরিয়েটাকে বিয়ে করে সুখে সংসার করবে মাইকেল– রেবেকা তা চাননি। মধু যখন বুঝলেন বিবাহ-বিচ্ছেদ পাবেন না, তখন হেনরিয়েটাকে কলকাতায় চলে আসতে লিখলেন। পিতার বিনা অনুমতিতে, ছদ্মনাম নিয়ে হেনরিয়েটা কলকাতায় চলে এসেছিলেন। মাইকেলের কলমে সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল।

নেশাগ্রস্থের মত মত্ত হয়েছিলেন তিনি সৃষ্টির আনন্দে– *শর্মিষ্ঠা*, *পদ্মাবতী*, *কৃষ্ণকুমারী*, *মায়াকানন* নাটক, *একেই কি বলে সভ্যতা? বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ*র মত প্রহসন, *তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*, *মেঘনাদবধ কাব্য*, *ব্রজাঙ্গনা কাব্য বীরাঙ্গনা কাব্য*– পাঁচ বছরে মাইকেল বাংলা নাটক ও কাব্যকে বলতে গেলে নিস্তরঙ্গ পুষ্করিণী থেকে মহাসমুদ্রে পরিণত করেছিলেন।

হেনরিয়েটা আর মাইকেল একসঙ্গে ছিলেন পনেরো বছর– প্রথমে কলকাতা, পরে ইউরোপ, আবার কলকাতা। হেনরিয়েটার গর্ভে মাইকেলের চারটি সন্তান হয়েছিল– শর্মিষ্ঠা, ফ্রেডরিক, অ্যালবার্ট। তৃতীয় সন্তান একটি মেয়ে সূতিকাগৃহেই মারা যায়।

যে বিদ্যাসাগরকে তিনি একসময় 'টুলো পণ্ডিত বলে ব্যঙ্গ করতেন, সেই বিদ্যাসাগরই তাঁর পরমবন্ধু হয়ে ওঠেন। কেবল বন্ধু নয়, 'ত্রাতা' বলা যায় তাঁকে। মাইকেল বিলেতে গিয়েছিলেন ব্যারিস্টার হবেন বলে। অমিতব্যয়িতা, বড়লোকী চাল দেখানো মাইকেলের বহু দিনের স্বভাব ছিল– বলা ভাল বদ-স্বভাব ছিল। এ জন্য তিনি মাদ্রাজ, কলকাতা, লন্ডন, ভার্সাই কোথাও শান্তি পাননি। পাওনাদারদের অভিযোগে তাঁকে পুলিশ-থানা পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। শেষ পর্বে, বিশেষ করে ইউরোপ বাসকালে বিদ্যাসাগর তাঁকে যে ভাবে বারবার টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তার তুলনা মেলা ভার।

১৮৬৬ সালের ১৭ই নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যারিস্টারির স্বীকৃতি পান মাইকেল। এই সুখের খবর তিনি সবার আগে জানিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে, 'আমি নিশ্চিত আপনি জেনে দারুণ খুশি হবেন যে, গত রাতে গ্রেজ ইন সোসাইটি আমাকে বার-এ ডেকে পাঠিয়েছিল এবং আমি অবশেষে ব্যারিস্টার হয়েছি। এর সব কিছুর জন্য আমি ঋণী প্রথমে ঈশ্বর এবং তাঁর নীচে আপনার কাছে। এবং আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, আমি চিরদিন আপনাকে আমার সবচেয়ে বড় উপকারী এবং সবচেয়ে খাঁটি বন্ধু বলে বিবেচনা করব। আপনি না হলে আমার যে কী হত।... প্রিয় বিদ্যাসাগর, আপনি ছাড়া আমার কোনও বান্ধব নেই।'

ছাত্রাবস্থায় অঙ্কে মধুসূদনের আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে করলে তিনি যে গণিতেও ভাল করতে পারতেন হিন্দু কলেজের ক্লাসে তার পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্য ছাত্ররা যে অঙ্ক করতে পারেনি, মধু সেই অঙ্ক করে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন– 'দেখলে তো শেক্সপিয়র ইচ্ছে করলে নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন ইচ্ছে করলে শেক্সপিয়র হতে পারতেন না।'

বেহিসেবি মাইকেল জীবনের অঙ্ক কোনওদিনই মেলাতে পারেননি, ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতায় এসে ব্যবসায় শুরুর আগেই হোটেলে বিলাসী জীবন কাটানো, পরিবারকে ভার্সাইতে রেখে আসার মত হঠকারী সিদ্ধান্ত, ধার করে ঘি খাওয়া– এই সবকিছুই তাঁর জীবনকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে নিয়ে গিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে গিয়েছিল এই পর্বে। ওদিকে ভার্সাইতে দারিদ্র্য পীড়িত হেনরিয়েটা মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেও তাঁদের অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

একসময় মাইকেল পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহের ম্যানেজারির চাকরি নিয়ে অজ-পাড়াগাঁ কাশীপুরে গিয়েছিলেন। তবে মন্দ কপাল কবির। এই চাকরিও থাকেনি। এক নাপিত রাজামশাইয়ের কান ভাঙিয়েছিলেন মাইকেলের নামে। ফলশ্রুতিতে প্রাণ বাঁচাতে রাতের অন্ধকারে পঞ্চকোট থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

১৮৭৩ সালের মার্চ মাস নাগাদ কবির স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। কন্যা শর্মিষ্ঠার তখন তেরো বছর বয়স, কবি তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন তাঁর দ্বিগুণ বয়েসি এক অ্যাংলো যুবকের সঙ্গে। মেয়ের বিয়ের পর সপরিবারে মাইকেল গেলেন উত্তরপাড়ায়– লাইব্রেরির ওপরতলায় উঠলেন, হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বদলি হয়ে আসা বাল্যবন্ধু গৌরদাস মধুকে দেখতে যান এবং দেখতে পান– 'সে তখন বিছানায় তার রোগযন্ত্রণায় হাঁপাচ্ছিল। মুখ দিয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছিল। আর তার স্ত্রী তখন দারুণ জ্বরে মেঝেতে পড়ে ছিল।'

পরদিন মাইকেলকে ভর্তি করানো হল আলিপুরের জেনারেল হাসপাতালে, গলার অসুখ তো ছিলই, যকৃতের সিরোসিস থেকে দেখা দিয়েছিল উদরী রোগ, হাসপাতালে কবির সঙ্গে একদিন দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর এক সময়ের মুন্সি মনিরুদ্দিন। মাইকেল তাঁর কাছে টাকাপয়সা আছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। মনিরুদ্দিন জানিয়েছিলেন, দেড় টাকা আছে। ওটাই চেয়েছিলেন মধু, তারপর তা বখশিস হিসেবে দিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সেবারতা নার্সকে।

২৬শে জুন হেনরিয়েটা মারা যান। মাইকেল এই সংবাদ এক পুরনো কর্মচারীর কাছ থেকে জানতে পারেন। ২৯শে জুন রবিবার, মাইকেলের অন্তিম অবস্থা ঘনিয়ে এল। বেলা দুটোর সময় চিরঘুমের দেশে চলে গেলেন কবি। এই মৃত্যুর পরেই সবকিছু শেষ হতে পারত, কিন্তু হয়নি। কবির নশ্বর দেহটা তখনও এই ধরাধামে ছিল। মৃত্যুর পর মাইকেলের শেষকৃত্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। কলকাতার খ্রিস্টান সমাজ তাঁকে সমাহিত করার জন্য মাত্র ছয় ফুট জায়গা ছেড়ে দিল না। ফলে কবির মরদেহে পচন ধরল। অবশেষে এগিয়ে এলেন অ্যাংলিকান চার্চের রেভারেন্ড পিটার জন জার্বো। বিশপের অনুমতি ছাড়াই, জার্বোর উদ্যোগে, ৩০শে জুন বিকেলে, মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টারও পরে লোয়ার সার্কুলার রোডের কবরস্থানে মাইকেলকে সমাধিস্থ করা হয়। চারদিন আগে সেখানেই হেনরিয়েটাকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। কবির কবর খোঁড়া হয় তার পাশেই। সে দিন ভক্ত ও বন্ধুবান্ধব মিলে উপস্থিত ছিলেন প্রায় এক হাজার মানুষ। কিন্তু একদিন শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় নিজের গ্রন্থ উৎসর্গ করে যাঁদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত করে গেলেন, সেই ভিড়ে ছিলেন না তাঁদের একজনও।

পরমা সংস্কৃতিকর্মী

জলছবি

আলী ইব্রাহিম

মিরা,
আজ এই জলট্রেনে আমার আর বসার কোনও জায়গা নেই।
দাঁড়িয়ে আছি পিরামিড হয়ে। একা। তুমি কাছে নেই।
জলের ওপর তোমাকে দেখছি। তোমার সাদা-কালো ছবি আঁকছি।
সেখানে এই আলী ইব্রাহিমের কবি হওয়ার গল্প লিখছি।
কিন্তু সাদা-কালো ছবিতে তোমাকে আজ চিনতে পারছি না।
না! না! চিনতে পারছি না! সেদিন তোমার মনটা এরকম ছিল না।
সেদিন তোমার চাহনি এরকম ছিল না। কপালের টিপ এরকম ছিল না।
এই নাক, এই চোখের মানুষটি সেই তুমি নও।
না! না! এই ছবিটি তুমি নও!
তোমাকে আজ অবিকল আঁকতে পারছি না! আঁকতে পারছি না!
সেই স্বপ্ন! সেই অনুভূতি! সেই আকাঙ্ক্ষা! আঁকতে পারছি না!
সেই রংধনু মন! সেই কুয়াকাটা মুখ! আঁকতে পারছি না!
তোমার ডান চোখে তিল ছিল। আঁকতে পারছি না।
তোমার হাসিতে টোল পড়ত। আঁকতে পারছি না।
তোমার চিন্তায় দার্শনিক অরুণ ছিল। আঁকতে পারছি না।

সামনে পোড়াগ্রাম। চারদিকে বিভ্রান্তির উত্তাপ। মুখচোরা পাখিদের চাওয়াচাওয়ি; সেখানে নিরুত্তর প্রশ্নবানে কেবলি ক্ষত বিক্ষত করছি তোমাকে ও আমাকে। আজ সেখানে কিছুতেই সেই তোমাকে আঁকতে পারছি না!

মিরা,
একবার এক জলপাখির সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল।
তার আগমনে কিঞ্চিৎ হৃদয় নেচে উঠেছিল। জলঘরে প্রজাপতি বসেছিল।
কিন্তু আমি কেবল ছুটে গেছি তোমার অধরে! তোমার ফাগুনঘরে!
সেই পাখিটা আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিল। আমি তার জন্যে এক পাও এগোয়নি। তুমি চাওনি। তাই তার ডানায় উড়িনি। তুমি চাওনি। তাই প্রজাপতি ধরিনি। তুমি আমাকে কবি হতে বলেছিলে। তাই কবি হয়েছি। মানুষ হইনি।

মিরা,
গতকাল বন্ধু আসিফ ফোন করেছিল।
ওর গ্রামের মানুষজন ওকে মিরাজ নামেই চেনে।
বললো, কি রে কবি! কী খবর তোর?
বউ-মেয়ে নিয়ে আছিস কেমন? বাড়ি-গাড়ি কিছু হল!
আরও বলল, রাজিব ঢাকায় জায়গা কিনেছে।
মুরাদও বাড়ি করেছে সেখানে। আমিও ঢাকায় স্থায়ী হব।
বাছেদ এখন আমেরিকায়। ওদের একটা মেয়ে আছে। একটা ছেলেও।
দিলিপ, টুটুল, মামুন; সবাই ভাল আছে। বিয়ে করেছে।
তোর খবর কী?

মিরা,
সেদিন কমলাপুর স্টেশনে তোমার বন্ধু বীথির সঙ্গে দেখা হয়েছিল।
বলল, এই যে কবি! তা তোমাদের গল্পটা কী শেষ হল!
আমি বীথিকে কিছুই বলিনি। বলতে পারিনি।
কথার আড়ালে এড়িয়ে গেছি।
আমি আসিফকেও আমাদের কোনও খবর দিতে পারিনি। দিইনি।
যে বন্ধুদের একসময় বলতাম, মিরা আমার বউ হবে।
ছোট্ট একটা ঘর হবে। আমাদের ঘরে আগে মেয়েই হবে।
মেয়ে হলে নাম রাখব ইসরাত জাহান ইরা।
সেইসব বন্ধুদের অপেক্ষায় রেখেছি।
কিছুই বলতে পারছি না আজ। কিছুই না।

মিরা,
তুমি আমাদের বন্ধুদের বলে দাও, আমাদের আর দেখা হবে না।
সেই দিন! সেই স্বপ্ন! আর আসবে না। ছোট্ট ঘরে বাবা বলে কেউ ডাকবে না। আজ এই জলজমিনে পাথর হয়ে গেছি! কাউকে কিছুই বলতে পারছি না। এখন শব্দ সাজাতে গিয়ে ধ্বনিগুলো এক এক করে পালায়।
এখন শরীর থেকে মাংস খসে পড়ে পোকা হয়ে মাটিতে লুটোপুটি খায়।

মিরা,
আজ সকালে বন্ধু রফিক ফোন করেছিল।
বলল, দোস্ত! এক হাজার টাকা ধার দিতে পারবি?
রফিক রাজনীতি করে। এখন রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসামি।
শুনেছি আদালতে হাজিরা দিতে দিতে চাকরিটাও চলে গেছে।
এখন কী করছে জানতে চাইনি।
তবে এইটুকু বুঝলাম নিদারুণ কষ্টে আছে।
আমার অক্ষমতায় সেও কষ্ট পেল বোধহয়।
ভাগ্গিস রফিক তোমার সম্পর্কে কিছু জানতে চায়নি!

মিরা,
তোমাকে ভালবেসে আজও আমার সমুদ্রে যাওয়া হল না।
তোমাকে ভালবেসে আজও আমার আকাশ ছোঁয়া হল না।
তোমাকে ভালবেসে আজও আমার বৃষ্টি দেখা হল না।
তবে তোমার কথামত আজ আমি কবি হয়েছি। কবি!
আজ আমার শরীরের একেকটি সুখের নাম কবিতা।
আজ আমার শরীরের একেকটি অসুখের নাম কবিতা।

মিরা,
আজ এই জলের ওপর তোমার দাঁত এঁকেছি। নখ এঁকেছি।
আগুন এঁকেছি। কিন্তু তোমার জলছবিটা কিছুতেই আঁকতে পারছি না!
তোমাকে আঁকতে পারছি না!

শাহীন রেজার দুটি কবিতা

শিশিরের ঠোঁট

দুর্বায় ডুবে যায় শিশিরের ঠোঁট,
আলপথে বেগুনি গন্ধ মেখে মটরশুঁটি
গুটিসুটি কেমন তাকায়;
এমন ভোরে–
রাতের কল্প হয়ে জেগে থাকে স্নেহলতা নারী
তার চোখ বাদামের বীজ হয়ে জোনাক-গল্প আঁকে
ফণীমনসায়

সেই কবে, বাঁশখালি জলে–
ডুব হয়ে ছুঁয়েছিল কাতলের বুক;
আজও জাগে
ভরা রাতে গাঙচিল সুখ, জেগে থাকে–
তাকে কি ভোলাতে পারে কইরী ছোঁয়া;
সুরুজের সলাজ চুমু?

কবি

বাতাসের ঘর তাকে ডাকলে সে ফিরিয়ে নিল মুখ–
বলল, যে ঘরে কপাট নেই তালা নেই; সে আমার নয়।

জলের প্রহর বাড়ালে পা, দূরে সরে গিয়ে সে জলান্ধ যুবকের
মত মাথা নাড়তে নাড়তে জানাল,
স্রোতের শ্যাওলার চেয়ে বৃক্ষ অনেক বেশি বিশ্বস্ত আর প্রার্থিত।

যখন পাখিরা তুলল ডানা, আর্তনাদ ধ্বনিত হল তার কণ্ঠে
উড়ালের চেয়ে অনেক আন্তরিক প্রিয়
রমণীর উর্বরতায় মাথা গুঁজে থাকা।

ফিরে গেলে বাতাস নদী জল
ইচ্ছে ভাঙার কষ্টে তখন সে কেবল একজন কবি
সে শুধু সূর্য খুঁজতে থাকল শব্দ খুঁজতে থাকল।

বাড়ি

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

যতবার দূরে থাকি মনে হয় কবে যাবো আবারও কাছে।
যতবার হারিয়ে ফেলেছি দূরত্বের নিবিড়ে নিজেকে
বিশাল ঐ নদী পার হয়ে মনে হয়েছে–
এই নদীটা কবে ফের দেবো পাড়ি।
ধরব বাড়ির পথ কবে সেই দিন।
দূরে এলেও তোমার মুখের আলো
মন থেকে নেভেনি কখনও– সেই আলো আমাকে
চিনিয়ে দিয়েছে বাড়ি ফেরার পথ বার বার।

রওশন রুবীর দুটি কবিতা

আমার তাড়া নেই

আমার তাড়া নেই; জমেও যাচ্ছে না ঘিয়ে ভাজা রুটি,
ফ্রাইফিস মুখে তুলে কফিতে চুমুক দাও, আরামে টানো।
আমার তাড়া নেই, তাড়া নেই জানো।
ওধারে সন্ধ্যা নামছে, আসবে এখুনি চাঁদ,
জানলা খোলাই থাক, আগমন হাস্নাহেনার।

আমার তাড়া নেই, তাড়া নেই টানেল ধরে এগিয়ে
যাবার। নিয়নবাতির নিচে রঙ বদলে দাঁড়ায় ক্ষণ;
ওদিকে চেয়ে যুদ্ধ-গমনের আশা কোরো না কেমন?
নিরিবিলি ছুটে যাও মন্দিরার কাছে, প্লেয়ারে বাজুক
সংগীত। আমার তাড়া নেই; তাড়া নেই জানো।

অচিরেই তুলে নেব মুঠোমুঠো জুঁই ফুল
সাথে নেব অবশেষে পিয়ারের দু'কুল।

আমরা দু'জন

আমরা দু'জন অনাবাদি রঙতুলিতে মেশা
আমাদেরই খুদকুঁড়োতে অন্যরকম নেশা

আমরা দু'জন বিকেল ভেঙে একটি সেতু গড়ি
আকাশ ছুঁতে দিনদুপুরে কারু মইয়ে চড়ি

আমাদের নেই গোলাপবাগান অঢেল কাঁটার ঘাত
এক মোহনায় ভিড়াই তরী এক মোহনায় প্রভাত।

রোদ মেখে হেঁটে যাই, যে পাশে তুমি

এস এম তিতুমীর

দিনের পরম্পরায়; রাত এসে যায়–
আমাদের বিশুদ্ধ প্রতীক্ষায়। পূর্বপুরুষের পায়ে-পায়ে
ধুলো, গুঁড়ো-গুঁড়ো প্রেম আর পুষে রাখা অভিন্ন কামনা–
আমাদের। মেঘ বলে তুমি দাও উড়িয়ে; চোখে-মুখে

ছায়া রোদে হাঁটি পাশাপাশি, জরা যতো-শুকোবার সুখে
বলে দিয়ো এ বাতাস ফুরোবার আগে; নুন ঠোঁটে–
কতটুকু মধুঝড় লাগে। ঘুম দিয়ে–
সবটুকু ব্যথা যেয়ো নিয়ে।

তারপর, উত্থিত আদরের ঝড়
বেহিসেবি। ফুল-ফল,অফুরান ধ্রুবতার অমৃতজল
তালপাখা আর। অনন্ত–

রোদ মাখা পথ, বিলিকাটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে রুদ্রতার
খিল খুলে ভাসি দু'জনাই– দু'জনার ঝড়ে
মৌনী তাপস তোমার, বাউলা নগরে।

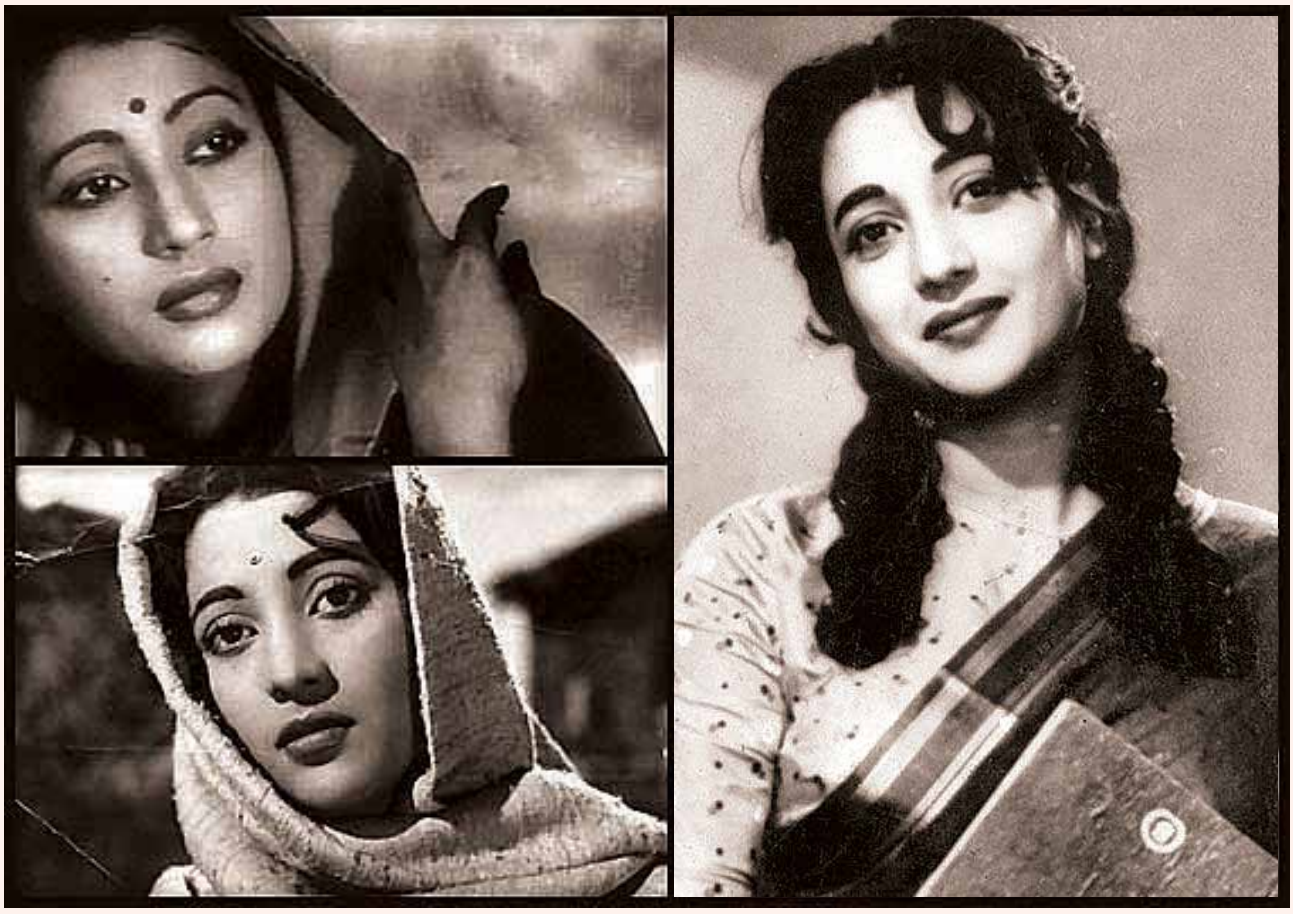

চলচ্চিত্র

স্মরণীয় অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন

রমা দাশগুপ্ত ছিল তাঁর পারিবারিক নাম। ১৯৬৩ সালে সাত পাকে বাঁধা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে সুচিত্রা সেন 'সিলভার প্রাইজ ফর বেস্ট অ্যাকট্রেস' জয় করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করে। শোনা যায়, ২০০৫ সালে তাঁকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল; কিন্তু সুচিত্রা সেন জনসমক্ষে আসতে চান না বলে এই পুরস্কার গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। ২০১২ সালে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বোচ্চ সম্মাননা বঙ্গবিভূষণ প্রদান করা হয়।

ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার অন্তর্গত সেন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে সুচিত্রা সেনের জন্ম) পাবনা জেলার সদর পাবনায় সুচিত্রা সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা করুণাময় দাশগুপ্ত ছিলেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ও মা ইন্দিরা দেবী গৃহবধূ। তিনি ছিলেন পরিবারের পঞ্চম সন্তান ও তৃতীয় কন্যা। পাবনা শহরেই তিনি পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন কবি রজনীকান্ত সেনের নাতনী।

১৯৪৭ সালে বিশিষ্ট শিল্পপতি আদিনাথ সেনের পুত্র দিবানাথ সেনের সঙ্গে সুচিত্রা সেনের বিয়ে হয়। তাঁদের একমাত্র কন্যা মুনমুন সেনও একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। ১৯৫২ সালে সুচিত্রা সেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হন।

চলচ্চিত্র জীবন

১৯৫২ সালে শেষ কোথায় ছবির মাধ্যমে তার চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয় কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি। উত্তমকুমারের বিপরীতে *সাড়ে চুয়াত্তর* ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। ছবিটি বক্স-অফিসে সাফল্য লাভ করে এবং উত্তম-সুচিত্রা জুটি উপহারের কারণে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। বাংলা ছবির এই অবিসংবাদিত জুটি পরবর্তী ২০ বছর ছিলেন আইকনস্বরূপ।

সম্মাননা

১৯৫৫ সালের দেবদাস ছবির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেন, যা ছিল তার প্রথম হিন্দি ছবি। উত্তম কুমারের সঙ্গে বাংলা ছবিতে রোমান্টিকতা সৃষ্টি করার জন্য তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেত্রী। ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে তার অভিনীত ছবি মুক্তি পেয়েছে। স্বামী মারা যাওয়ার পরও তিনি অভিনয় চালিয়ে গেছেন, যেমন হিন্দি ছবি আঁধি। এ চলচ্চিত্রে তিনি একজন জননেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বলা হয় যে চরিত্রটির প্রেরণা এসেছে ইন্দিরা গান্ধী থেকে। এই ছবির জন্য তিনি ফিল্মফেয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং তার স্বামী চরিত্রে অভিনয় করা সঞ্জীবকুমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার জিতেছিলেন। হিন্দি চলচ্চিত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতিবছর দাদাসাহেব সম্মাননা প্রদান করে ভারত সরকার। চলচ্চিত্রের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এ সম্মাননা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন সুচিত্রা সেন। ২০০৫ সালে দাদাসাহেব সম্মাননা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি। সম্মাননা নিতে কলকাতা থেকে দিল্লি যেতে চাননি বলেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।

১৯৫৪ সালে সুচিত্রা সেনকে অভিনয় ছাড়তে বলেছিলেন স্বামী দিবানাথ সেন। কারণ উত্তমকুমারের সঙ্গে রোমাঞ্চের সম্পর্ক। আসলেই কি উত্তম-সুচিত্রা জুটির মধ্যে ব্যক্তি-রসায়ন ছিল। এ ধোঁয়াশা ঘেরা প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজে ফেরেন ভক্তরা। ১৯৫৩ সালে এই জুটির প্রথম ছবি *সাড়ে চুয়াত্তর* মুক্তি পেয়ে হিট হয়। প্রথম ছবিতেই দর্শক তাদের পর্দার মত বাস্তব জীবনেও প্রেমিক যুগল ভাবতে থাকে। এই ভাবনা জোরালো হয় ১৯৫৪ সালে। ওই বছর মুক্তি পায় তাঁদের ছ'টি ছবি। প্রতিটি ছবিতেই জীবনঘনিষ্ঠ অভিনয়ের কারণে দর্শকের মনে উত্তম-সুচিত্রার প্রেমের কল্পকথা জোরালো হতে থাকে। তবে দর্শকের অন্ধবিশ্বাসের মূলে জলসিঞ্চন করেন সুচিত্রা নিজেই। ওই বছর মুক্তি পায় *অগ্নিপরীক্ষা*। এ ছবির পোস্টারে লেখা ছিল– 'আমাদের প্রণয়ের সাক্ষী হল অগ্নিপরীক্ষা'। নিচে ছিল সুচিত্রার স্বাক্ষর। এই পোস্টার দেখে অঝোরে কেঁদেছিলেন উত্তমকুমারের স্ত্রী গৌরী দেবী। অন্যদিকে এর আঁচ ছড়িয়েছিল সুচিত্রার দাম্পত্য জীবনেও। উত্তম-দিবানাথের সম্পর্কের অবনতি এখান থেকেই শুরু। স্বামীর জোরালো সন্দেহের কারণে ওই বছর চুক্তিবদ্ধ হওয়া আরও চারটি ছবিতে কাজ করতে পারেননি সুচিত্রা। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও অভিনয় ছাড়তে রাজি হননি মহানায়িকা। সুচিত্রা সেনকে চিত্রজগতের সবাই মিসেস সেন বলে ডাকতেন। কিন্তু উত্তম কুমার ডাকতেন রমা নামে।

আর উত্তমকুমারকে রমা ডাকতেন 'উতো' বলে। দাম্পত্যকলহ বাড়তে থাকায় মেয়ে সুচিত্রা মুনমুনকে পাঠিয়ে দেন দার্জিলিংয়ে কনভেন্টে পড়তে। ১৯৫৭ সালে উত্তমকুমার *হারানো সুর* প্রযোজনা করলেন। নায়িকা হতে বললেন সুচিত্রা সেনকে। উত্তম প্রযোজনা করছেন শুনে সুচিত্রা সেন বললেন, 'তোমার জন্য সব ছবির ডেট ক্যান্সেল করব।' হলও তাই। এতে আরও ক্ষেপলেন দিবানাথ।

নকশাল হামলা থেকে মবিং। পরিস্থিতি যতই দূরূহ হোক, সুচিত্রা সেন সামলে দিতেন অবলীলায়। মহানায়িকার সেই দাপট দিনের পর দিন খুব কাছ থেকে দেখেছেন অমল শূর। অসিত সেনের সঙ্গে পাঁচটা ছবিতে (*উত্তর ফালগুনী*, *আলো আমার আলো*, *মমতা* (হিন্দি), *কমললতা*, *মেঘ কালো*) অ্যাসিস্ট করতে গিয়েই আলাপ। শুক্রবারের এক দুঃখী দুপুরে সেই সব না-বলা গল্পের ঝাঁপি খুলে বসলেন শতরূপা বসু-র সামনে 'আমায় যেন চিতায় দাহ করা হয়। চুল্লিতে আমি যাব না। আমি ধোঁয়া হয়ে আকাশে উড়ে যাব, ছাই হয়ে মাটিতে মিশে যাব'– এটাই শেষ ইচ্ছে ছিল সুচিত্রা সেনের। সবাই ভেবেছিলেন, বেলুড় মঠে হবে শেষকৃত্য।

আপনাদের বিপ্লব কি সুচিত্রা সেনকে নিয়ে? *আলো আমার আলোর* শ্যুটিংয়ের একটা ঘটনা। তখন নকশাল আমল। এনটি ওয়ান থিয়েটার্সে চলছিল শ্যুট। নিজের মেক-আপ রুমে বসে তৈরি হচ্ছিলেন সুচিত্রা। হাতে *আলো আমার আলোর* চিত্রনাট্য। ম্যাডাম কোনওদিনই সংলাপ মুখস্থ বলতেন না। চিত্রনাট্যটা পড়তেন ভাল করে।

একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল ওঁর রিয়্যাকশন। সেটাই করছিলেন। এমন সময়, ওঁর ঘরে ঢুকে পড়ে তিনটি ছেলে। তাদের প্রধান ছিল রঞ্জিত নামে একটি ছেলে। হঠাৎ কানে এল চিল চিৎকার– 'গেট আউট, গেট আউট!' হুড়মুড়িয়ে এসে দেখি সুচিত্রা সেন চিৎকার করে ছেলেগুলিকে বকছেন, 'কোন সাহসে আপনারা আমার ঘরে পারমিশান ছাড়া ঢুকেছেন?' ছেলেগুলোও তেমনি, কিছুতেই যাবে না। অবশেষে, 'বেশ করেছি... দেখে নেব'– বলে চলে গেল। স্টুডিয়োর গেট বন্ধ করে দেওয়া হল। স্টুডিয়ো মালিককে বলে লালবাজারে পুলিশে খবর দিয়ে সুচিত্রা নিজের প্রটেকশনের ব্যবস্থা নিজেই করলেন।

সেদিনের শ্যুটিং শেষ হল। ততক্ষণে প্রায় ৫০০ ছেলে জড়ো হয়েছে গেটের বাইরে। গেটের ভেতরে সুচিত্রা সেনের গাড়ি দাঁড়িয়ে। ড্রাইভার ছিল না। উনি গিয়ে হর্নটা চেপে ধরলেন। ঝাঁ-ঝাঁ হর্ন বাজছে। ড্রাইভার দৌড়ে এল। সুচিত্রা সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর, সবার বারণ সত্ত্বেও গেট খোলার নির্দেশ দিলেন। ৫০০ ছেলে হামলে পড়ল গাড়ির উপর। উনি আস্তে আস্তে গাড়ির কাচ নামালেন। তারপর দরজা খুললেন। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'আপনি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

সুচিত্রা আরও কঠিন হয়ে গেলেন। বললেন, 'কে আপনারা? স্টুডিয়ো আমার প্রফেশনাল জায়গা। আমার পারমিশন না নিয়ে ঢুকেছিলেন বলেই আমি আপনাদের বারণ করি। ক্ষমা আমি চাইব না। আপনারা বলুন কি চান?' ওরা বলল, 'আমরা বিপ্লবী'। সুচিত্রা বললেন, 'আপনাদের বিপ্লব কি সুচিত্রা সেনকে নিয়ে? যদি আপনাদের কোনও সাহায্য লাগে আমি করতে পারি। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই নেই। আমি এখানে গাড়িতে বসে রইলাম। আপনাদের যা খুশি করতে পারেন।'

এরপর, ছেলেরা ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত ওদের নেতা বলে, 'দিদি আমাদের ক্ষমা করবেন।' মনে হল যেন ৫০০টা ছেলে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। এমনই সাহস আর ব্যক্তিত্ব ছিল সুচিত্রা সেনের। নিজে ঝামেলার মুখোমুখি হতেন। আর কারও, এমনকি উত্তমকুমারেরও এরকম পাবলিক হ্যান্ডেল করবার সাহস আর ক্ষমতা ছিল না।

আরেকবার, অষ্টমীর দিন সন্ধেবেলা, আমরা গাড়ি করে বেরিয়েছি। ব্রাবোর্ন রোড থেকে লিটন স্ট্রিট-এর দিকে যাচ্ছি। ভিড়ের জন্য গাড়ি এগোচ্ছে খুব ধীরে। এমন সময় একটি মেয়ে, সেও খুবই সুন্দরী, দূর থেকে ম্যাডামকে দেখে। চোখাচোখি হয় দু'জনের। অন্য ফ্যানেদের মত মেয়েটি কিন্তু দৌড়ে না এসে ম্যাডামকে একটা ফ্লাইয়িং কিস ছুঁড়ে দেয়। উত্তরে ম্যাডাম হাত মুঠো করে সেটি নিয়ে, নিজের সারা মুখে মেখে, ওর দিকে পাল্টা কিস ছুঁড়ে দেন। এমনই ছিল তাঁর মেজাজ। মেয়েটি যে তাঁর দিকে ছুটে আসেনি সেটা খুব পছন্দ হয়েছিল ম্যাডামের। গাড়ি ছেড়ে দেয়।'

একবার উত্তম কুমার *সন্ন্যাসী রাজার* প্রজোযক অসীম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন। লোক জমায়েত হওয়ার ফলে ঝামেলার সম্মুখীন হন। তারপর পুলিশ আসাতে সে-যাত্রায় বেঁচে যান। সুচিত্রার মত নিজে ঝামেলার মুখোমুখি কিন্তু হননি।

অমল আরও বলছেন, 'নকশাল পিরিয়ডে ঝামেলার জন্য প্রায়ই ম্যাডামের বাড়ির গেস্ট -রুমে থেকে যেতাম। ম্যাডামই বাড়ি ফিরতে বারণ করতেন। বিশাল বাড়ি। একটা পূর্ণ দৈর্ঘের টেনিস লন ছিল সেখানে। পোর্টিকো পেরিয়ে, বিরাট লিভিং রুম, 'এল'-শেপের শ্বেতপাথরের বারান্দা পেরিয়ে ওঁর ঘর। মাঝখানে মুনমুনের ঘর। আর একেবার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গেস্ট-রুম। আমি একবার বলেছিলাম, 'আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। আমাকে 'আপনি' বলেন কেন?' বলেছিলেন, 'তুই' আমার অন্তরে। বাইরে 'আপনি'। আমি যদি সর্বসমক্ষে 'তুই' করে বলি তাহলে লোকে আপনাকে আমার চামচা বলবে। সম্মান করবে না। তাই, 'আপনি'ই থাক।

'বাড়িতে জাপানি কাফতান পরতেন। একবার ওঁর বাড়িতে থেকে গিয়েছি। আমাকে একটা কড়কড়ে নতুন শাড়ি দিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'এটা পরে শুয়ে পড়ুন। আমাকেই পাওয়া হবে।' আজ এই কথাগুলো বলতে বলতে গলা বুজে আসছে। সবার একটা ধারণা ছিল, সারাদিন সুচিত্রা সেন পুজোর ঘরে কাটাতেন। এটার কারণটা কী জানেন ? ওঁর পুজোর ঘরে একটা বড় কাঠের সিংহাসন ছিল। তার ওপর প্রচুর বিগ্রহ। রূপোর রাধা-কৃষ্ণ

থেকে শুরু করে আরও অনেক। এই সিংহাসন রোজ ফুল দিয়ে সাজাতেই ওঁর প্রায় ঘণ্টাদেড়েক লাগত। এটা করতে গিয়েই আসলে সময়টা যেত।

উত্তমকুমারের সঙ্গে ওঁর কোনও রোম্যান্টিক সম্পর্ক ছিল না। বলেছিলেন, 'আমি উত্তমের গলা ধরে ঝুলতে পারি। তাতে আমার বা উত্তমেরও কোনও 'সেনসেশন' হবে না। যেটা আমার ক্ষেত্রে অন্য পুরুষের সঙ্গে হতে পারে।'

'একবার একটা ঘটনা দেখেছিলাম। ম্যাডামের বাড়ি ঢুকছি, দেখি উত্তম ম্লানমুখে বসে আছেন। চলে যাওয়ার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেছিলেন, কোনও এক সমস্যা নিয়ে উত্তম এসেছিলেন তাঁর কাছে। কী সমস্যা সেটা অবশ্য ম্যাডাম আমাকে বলেননি। তবে, উত্তম নাকি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমাদের বিয়ে হলে কেমন হত?' ম্যাডাম তার উত্তরে বলেছিলেন, 'একদিনও সেই বিয়ে টিঁকত না। তোমার আর আমার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত স্বতন্ত্র। আর খুব স্ট্রং। সেখানে সংঘাত হতই। তার ওপর, তুমি চাইবে তোমার সাফল্য, আমি চাইব আমার। এ রকম দু'জন বিয়ে করলে সে বিয়ে খুব বাজেভাবে ভেঙে যেত।'

শাসনও করতেন উত্তমকে। উত্তমকুমারের একটা ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল সুচিত্রা সেনের প্রতি। বলতেন, 'তোমার কোনও বেচাল দেখলে কিন্তু আমি বলব।' বেণুদির (সুপ্রিয়া দেবী) সঙ্গে বিয়েতে যে আপত্তি করেছিলেন তা নয়। তবে উত্তমকুমারের মা আর স্ত্রী গৌরীদেবীকে নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু, নিজের সঙ্গে উত্তমের সম্পর্ক নষ্ট হতে দেননি কোনওদিন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

ব্যক্তিত্ব

পার্থপ্রতিম মজুমদার ॥ বিশ্ববন্দিত মূকাভিনেতা

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ফ্রান্স সরকারের শেভালিয়র উপাধি পেয়েছেন তিনি। তিনি মঞ্চের পাশাপাশি ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার বিভিন্ন চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। তাঁর অভিনীত একটি ফরাসি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ২৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়। প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, নিউ ইয়র্কসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর মূকাভিনয়ের প্রদর্শনী হয়েছে। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, নাইকি, আইবিএম ও ম্যাকডোনাল্ডের মত বিশ্বখ্যাত কোম্পানির পণ্যের প্রচারে মডেল হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি।

পুরস্কার ও সম্মাননার সূচনা কলকাতা যোগেশ মাইম একাডেমি থেকে 'মাস্টার অফ মাইম' উপাধি (১৯৮৭) দিয়ে। একক মূকাভিনেতা হিসেবে এথেন্স, নিউইয়র্ক, ডেনমার্ক, সুইডেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ (১৯৮৮) করেন তিনি। মালয়েশিয়ার সাংবাদিকদের কাছ থেকে 'মাস্টার অফ ওয়ার্ল্ড' সম্মাননা; লন্ডনে অনুষ্ঠিত বেঙ্গলি লেটারেচার ফেস্টিভালে একমাত্র বাঙালি অতিথি শিল্পী হওয়ার বিরল সৌভাগ্য (১৯৮৯) লাভ করেছেন। পেয়েছেন 'বার্দোতে' ও 'ননত' শহরের মেয়রের মেডেল (১৯৯১); নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ফোবানা সম্মেলন ২০০০ বিশেষ সম্মাননা (২০০০); ইউকে মিলেনিয়াম এ্যওয়ার্ড ২০০০ এবং ফ্রান্সের জাতীয় থিয়েটারের মোলিয়ার অ্যাওয়ার্ড (২০০৯)। পেয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের একুশে পদক (২০১০) ও ফ্রান্স সরকারের শেভালিয়র (নাইট) উপাধি (২০১১)।

এই অভিনন্দিত বাঙালি মাইম শিল্পর নাম রপার্থপ্রতিম মজুমদার। জন্ম পাবনা জেলার কালাচাঁদপাড়ায়। তিনি ছিলেন বাবা মায়ের দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর বাবার নাম হিমাংশুকুমার বিশ্বাস এবং মায়ের নাম সুশ্রিকা বিশ্বাস। ছোটবেলার তাঁর নাম ছিল প্রেমাংশুকুমার বিশ্বাস । ডাক নাম ভীম। কণ্ঠশিল্পী বাপ্পা মজুমদারের বাবা পাবনার জমিদার এবং প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গসংগীতশিল্পী ওস্তাদ বারীণ মজুমদার ছিলেন তাঁর দুঃসম্পর্কের আত্মীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় বারীণ মজুমদারের মেয়েটি হারিয়ে যায়। তখন মেয়ে-হারানো বারীণ মজুমদারের অনুরোধে তিনি চলে যান ঢাকার ২৮ নম্বর সেগুনবাগিচার বাসায়। তখন থেকেই তিনি পার্থপ্রতিম মজুমদার নামে পরিচিত। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি সেগুনবাগিচায় ছিলাম।

প্রথম পড়াশুনা শুরু বাড়ি থেকে খানিক দুরে জুবিলী স্কুলে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বড় ভাইয়েরা তাকে কাকা সুধাংশুকুমার বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে কলকাতা শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে চন্দননগরে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ড. শীতলপ্রসাদ ঘোষ আদর্শ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় পরিচয় হয় মূকাভিনয় বা মাইমের আর্টিস্ট যোগেশ দত্তের সঙ্গে। তাঁর কাছে মাইম শেখা শুরু। পার্থপ্রতিম মজুমদার ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কলকাতার যোগেশ দত্ত মাইম একাডেমিতে মাইমের ওপর শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে ভারতের চন্দননগর থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৭২-'৭৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা মিউজিক কলেজ থেকে স্নাতক হন । ১৯৮১-'৮২ সালে মডার্ন কর্পোরাল মাইমের উপর 'ইকোল দ্য মাইম' নামে এতিয়েন দ্যু ক্রু কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন । এরপর ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত মারসেল মার্সোর কাছে 'ইকোল ইন্টারন্যাশনালি দ্য মাইমোড্রামা দ্য প্যারিস'-এ মাইমের উপর উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করেন ।

পার্থপ্রতিম মজুমদার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মূকাভিনয় করে গৌরবমণ্ডিত করেছেন বাংলাকে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) দুটি অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মত মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন তিনি। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪৮ বার মাইম প্রদর্শন করেন। এছাড়া ঢাকার ড্রামাটিক আর্টস স্কুলে মাইমের শিক্ষকতার পাশাপাশি বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন থিয়েটার গ্রুপের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মাইমের উপর কর্মশালা পরিচালনা করেন। ১৯৮২-'৮৫ সালে তিনি প্যারিসের বিভিন্ন থিয়েটারে মোট ২৬টি শো করেন। এছাড়া লন্ডনে ২টি, গ্রিসে ২টি এবং স্পেনে মাইমের ২টি শো করেন। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে মারসেল মার্সোর সঙ্গে আমেরিকা যান এবং সেখানে মার্সোর নির্দেশনায় 'ইকোল ইন্টারন্যাশনাল ডি মাইমোড্রামা ডি প্যারিস-মারসেল মার্সো' নামে একটি শো করেন। ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে পার্থপ্রতিম মারসেল মার্সোর কোম্পানি এবং 'থিয়েটার দ্য লা স্পেহয়ার'-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ইতালিতে মাসব্যাপী 'লে কারগো দ্য ক্রেপুসকুল' এবং 'আবিম' নামে দুটি মাইমোড্রামা প্রদর্শন করেন। এবছরগুলোতেই প্যারিসে দুটি ছোট বিষয়কে নিয়ে ক্যামেরার সামনে হাজির হন এবং প্যারিসেই তাঁর কাজের উপর একটি বড় ভিডিও ধারণ করা হয়। এসময় ফ্রান্সের টেলিভিশনে তাঁর একটি কাজ প্রদর্শন করা হয় । এছাড়া লন্ডনে একটি ছোট ভিডিও ধারণসহ 'বিবিসি'তে তাঁর একটি কাজ প্রদর্শন করা হয়। ১৯৮৬ সালে মারসেল মার্সোর তত্ত্বাবধানে পার্থপ্রতিম মজুমদার মাইমের তত্ত্ববিষয়ক গবেষণা কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাইম প্রদর্শন করেন। তিনি 'নিঃশব্দ কবিতার কবি' বলেও পরিচিত। বাংলাদেশে এইডসের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সচেতনতামূলক আয়োজনেও অংশ নিয়েছেন তিনি।

• সংকলিত

১৭৮৯ সালে আঁকা ফ্রানসিস্কো রেনাল্ডির তৈলচিত্রে মসলিন পরিহিত ঢাকার মুসলিম নারী

ঐতিহ্য

ঢাকাই মসলিনের পুনর্জন্ম

মসলিন কি কেবলই কাপড়? এই বাংলাদেশের ঐতিহ্যের কথা বললে, ইতিহাসের কথা বললে মসলিনকে বাদ দেওয়ার কোনও উপায় নেই। তাই মসলিনের পুনর্জন্ম ঘটাতে ছয় বছর ধরে লেগে ছিলেন একদল গবেষক। অবশেষে তাঁরা সফলও হয়েছেন। কী বিচিত্র উপায়ে সংগ্রহ করা হল মিহি মসলিনের উপাদানগুলো, তা একেকটা গল্পই বটে। ঢাকাই মসলিনের শেষ প্রদর্শনী হয়েছিল লন্ডনে ১৮৫০ সালে। এর ১৭০ বছর পরে বাংলাদেশে আবার বোনা হল সেই ঐতিহ্যবাহী ঢাকাই মসলিন কাপড়ের শাড়ি। ঠিক সে রকমই, যেমনটি বলা হত– আংটির ভেতর দিয়ে গলে যায় আস্ত একটি শাড়ি। ইতোমধ্যে ঢাকাই মসলিনের জিআই স্বত্বের অনুমোদন পাওয়া যায়। ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ এ-সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয়। প্রচলিত আছে, মসলিন শিল্পীদের আঙুল কেটে দেওয়ার পরে ঢাকাই মসলিন তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। এখন ভারতেও মসলিন তৈরি হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকাই মসলিনের বিশেষত্বই আলাদা। তাই ঢাকাই মসলিন তৈরির জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন গবেষকদল। তাঁদের ছয় বছরের অক্লান্ত চেষ্টা আর গবেষণায় তৈরি হয়েছে মসলিনের ছয়টি শাড়ি। যার একটি গবেষকেরা প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিয়েছেন।

কিন্তু শুরুতে এক টুকরো 'অরিজিনাল' মসলিন কাপড় জোগাতে কলকাতা থেকে লন্ডন পর্যন্ত ছুটতে হয়েছে গবেষকদের। মসলিন বোনার সুতা যে 'ফুটি কার্পাস' তুলার গাছ থেকে তৈরি হয়, সেই গাছ খুঁজে বের করা হয়েছে বিচিত্র সব পন্থা অবলম্বন করে। যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে এসেও এই শাড়ি তৈরিতে তাঁতিদের হাতে কাটা ৫০০ কাউন্টের সুতাই ব্যবহার করতে হয়েছে। কাপড়ও বোনা হয়েছে হস্তচালিত তাঁতেই।

১৭৬৩ সালের জুন মাসের কথা। বাংলা থেকে রওয়ানা হয়ে নানা বন্দর পেরিয়ে 'দ্যা ফক্স' নামের জাহাজ পৌঁছেছে বিলাতে। ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে বিক্রির জন্য জাহাজটি নিয়ে এসেছে নানান পণ্য যার মধ্যে একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে হরেকরকম বস্ত্র। আর এই হরেকরকম বস্ত্রের সিংহভাগ জুড়ে আছে মলমল নামের একপ্রকার বস্ত্র। তের হাজার তিনশো বায়ান্ন খণ্ড মলমলের এই চালানটি এসেছে বাংলার শিল্পনগরী ঢাকা থেকে। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ মসলিন কারিগরদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই মলমল। মলমলের পাশাপাশি এই চালানে আছে শবনম ও সারবান্দ নামে আরও দুই ধরনের মসলিন। এটা ছিল কেবল একটি জাহাজে বহন করা মসলিনের পরিমাণ। পুরো ১৮ শতক জুড়েই এরকম শত-সহস্র জাহাজ বাংলা থেকে নিয়ে গেছে সে সময়ের হিসাবে লক্ষ লক্ষ টাকার মসলিন।

মসলিনের স্বর্ণযুগ ছিল মুঘল আমল। মুঘল পৃষ্ঠপোষকতায় সে সময় ঢাকা ও তার আশেপাশে গড়ে উঠেছিল তাঁতি আর তুলা চাষীদের আবাস। দিল্লির সম্রাটের ফরমান অনুযায়ী এসময়ে তৈরি হয়েছে মলবুস খাস থেকে শুরু করে সরকার-ই-আলা, আব-ই-রওয়া, নয়নসুখ, বদনখাস, সরবুটি, ইত্যাদি নানা নামের মসলিন।

গোড়ার কথা

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মসলিনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার কথা বলেন। বাংলাদেশের কোন্ কোন্ এলাকায় মসলিন সুতা তৈরি হত, তা জেনে সে প্রযুক্তি উদ্ধারের নির্দেশনা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. মনজুর হোসেন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহ আলীমুজ্জামান, বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আখতারুজ্জামান, বিটিএমসি ঢাকার মহাব্যবস্থাপক মাহবুব-উল-আলম, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের উপমহাব্যবস্থাপক এ এস এম গোলাম মোস্তফা ও সদস্যসচিব তাঁত বোর্ডের জ্যেষ্ঠ ইনস্ট্রাক্টর মো. মঞ্জুরুল ইসলাম। পরে গবেষণাকাজের স্বার্থে আরও সাত সদস্যকে এই কমিটিতে যুক্ত করা হয়। এঁরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুলবন ওসমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এম ফিরোজ আলম, অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রি ল' বিভাগের অধ্যাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আইয়ুব আলী ও বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রাজশাহীর গবেষণা কর্মকর্তা মো. আবদুল আলিম।

এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য 'বাংলাদেশের সোনালি ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরির প্রযুক্তি ও মসলিন কাপড় পুনরুদ্ধার (প্রথম পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পের প্রধান বৈজ্ঞানিক করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. মনজুর হোসেনকে। আর প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত হন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আইয়ুব আলী।

কাজের শুরুতে মসলিন কাপড় বা তুলার কোনও নমুনাই গবেষকদের কাছে ছিল না। তাঁদের প্রথম কাজ ছিল যে তুলা থেকে সুতা কেটে মসলিন শাড়ি বোনা হত, সেই তুলার গাছ খুঁজে বের করা। সেই গাছটি আসল ফুটি কার্পাস কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার মসলিন কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। এই দুটি জিনিস জোগাড় করাই এই প্রকল্পের প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে।

ফুটি কার্পাসের খোঁজে

প্রকল্পের প্রধান বৈজ্ঞানিক মো. মনজুর হোসেন জানান, মসলিন কাপড়ের

নমুনা পেলে তার সুতার ডিএনএ সিকুয়েন্স বের করে ফুটি কার্পাস গাছের ডিএনএর সঙ্গে মিলিয়ে দেখাই ছিল তাঁর দলটির প্রধান কাজ। কিন্তু হাতে কোনও মসলিন কাপড়ের নমুনা নেই, নেই ফুটি কার্পাসের কোনও চিহ্নও। ছিল শুধু সুইডিস গবেষক ক্যারোলাস লিনিয়াসের লেখা *স্পেসিস প্লান্টেরাম*, আবদুল করিমের *ঢাকাই মসলিন*-এর মত কিছু বই। এর মধ্যে ক্যারোলাস লিনিয়াসের বইতে মসলিন কাপড় বোনার জন্য 'ফুটি কার্পাস' উপযুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়। এই গাছ পূর্ব ভারত তথা বাংলাদেশে চাষ হত বলে সেখানে লেখা রয়েছে।

অধ্যাপক মনজুর হোসনে বলেন, ফুটি কার্পাসের বন্য অবস্থায় বাংলাদেশের কোথাও টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে। এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্য অবস্থায় পাওয়া তুলার জাত সংগ্রহ, নিজেদের গবেষণা মাঠে চাষ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরিকল্পনা করা হয়। গাছটি খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রথমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার এক শিক্ষার্থীকে দিয়ে এর ছবি আঁকানো হয়। সেই ছবি দিয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিটিভিতে প্রচার করা হয়। এর মধ্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তাঁর ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দেন। এটা দেখে গাজীপুরের কাপাসিয়া এলাকার একটি কলেজের অধ্যক্ষ মো. তাজউদ্দিন ফুটি কার্পাসের সন্ধান চেয়ে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুল-কলেজে প্রচারপত্র বিলি করেন এবং মাইকিং করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে গাজীপুরের কাপাসিয়া ও রাঙামাটি থেকে এই গাছের খবর আসে। গবেষকেরা গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেন। এরপর রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, সাজেক ও লংদু এবং বাগেরহাট, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম থেকে মোট ৩৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা হিসেবে নেওয়া হয় গাছের তুলা, বীজ, পাতা, কাণ্ড ও ফুল। গবেষকেরা কাপাসিয়ার একটি গাছের জাতের সঙ্গে স্কেচের (আঁকা ছবির) মিল পান। সম্ভাব্য ফুটি কার্পাসের এই জাতটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের নিজস্ব মাঠে ও আইবিএসসির মাঠে চাষ করা হয়।

কলকাতা থেকে লন্ডন

একইভাবে স্থানীয় উৎস থেকে মসলিন কাপড় সংগ্রহ করার জন্য ২০১৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ঢাকার একটি প্রধান দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এরপর তাঁরা প্রায় দুই হাজার ফোন পান। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ৮টি কাপড়ের নমুনা পাওয়া যায়। গবেষক দল নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে ৩০০ বছর আগের শাড়িও পেয়েছেন। পরে পরীক্ষা করে দেখা যায়, তা আসলে পুরনো সিল্কের কাপড়।

দেশের অন্য কোনও উৎস থেকে মসলিনের নমুনা না পেয়ে তাঁরা জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দেন। গবেষকদের দরকার ছিল চার বাই চার ইঞ্চির এক টুকরো ঢাকাই মসলিন কাপড়। কিন্তু কিছুতেই তাদের নমুনা দিচ্ছিল না জাদুঘর। এমনকি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে আসার পরেও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাদের মসলিনের নমুনা দেয়নি। গবেষক দলটি জাতীয় জাদুঘরের নমুনার আশায় প্রায় আট মাস পার করে ফেলেন। একপর্যায়ে মসলিনের নমুনা সংগ্রহের জন্য তাঁরা কলকাতায় ভারতের ন্যাশনাল মিউজিয়াম যান। এ মিউজিয়ামের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মুর্শিদাবাদে এখন যে মসলিন শাড়ি তৈরি হচ্ছে, তা দক্ষিণ ভারতে উৎপাদিত তুলা থেকে করা হয়, যা ঢাকাই মসলিনের মত মোলায়েম নয়। তাঁদের মতে, ঢাকাই মসলিন তৈরি করতে হলে ঢাকার আশপাশ থেকে জাত খুঁজে বের করে সেই তুলা দিয়ে সেই এলাকাতেই করতে হবে। মসলিন তৈরিতে তুলার জাত এবং আবহাওয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। চাইলেই যেখানে-সেখানে ঢাকাই মসলিনের মত শাড়ি তৈরি করা যাবে না।

ভারতে গিয়ে বিফল হয়ে গবেষকদল হতাশ হয়ে পড়েন। অধ্যাপক মনজুর হোসেন বলেন, এ খবর শুনে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে যেতে বলেন। তিনি সেখানে ঢাকাই মসলিন দেখে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত মসলিনের একটু নমুনার জন্য ২০১৭ সালের জুলাইয়ে কমিটির তিন সদস্যসহ চার সদস্যের একটি দল লন্ডনের ওই মিউজিয়ামে যান। সেখানে মসলিনের কাপড়ের নমুনা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত তাঁরা পেয়ে যান। মসলিনের নমুনা ও তথ্য-উপাত্ত তাঁদের নতুনভাবে প্রাণিত করে। তাঁরা পুর্ণোদ্যমে কাজে লেগে পড়েন। প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা তাঁদের কাছে ছিল আলোকবর্তিকার মত।

অবশেষে সেই ফুটি কার্পাস

লন্ডন থেকে সংগৃহীত মসলিন কাপড়ের ডিএনএ সিকুয়েন্স বের করা হয়। গবেষকেরা এই মসলিনের ডিএনএর সঙ্গে আগে সংগৃহীত কাপাসিয়ার একটি জাতের ফুটি কার্পাস গাছের মিল পান অবশেষে। তাঁরা নিশ্চিত হন, সেটিই তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জাতের 'ফুটি কার্পাস'। স্থানীয় আবদুল আজিজ নামের এক ব্যক্তি এই কার্পাসের সন্ধান দিয়েছিলেন। খুশি হয়ে এই কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মোবাইল ফোন উপহার দেওয়া হয়।

তুলা থেকে ৫০০ কাউন্টের সুতা তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই সুতা আধুনিক যন্ত্রে হবে না, চরকায় কাটতে হবে। সুতা তৈরির কাজের নেতৃত্ব দেন কমিটির সদস্যসচিব ও তাঁত বোর্ডের জ্যেষ্ঠ ইনস্ট্রাক্টর মঞ্জুরুল ইসলাম। এবার খোঁজ শুরু হয় দেশের কোথায় এখনও তাঁতিরা চরকায় সুতা কাটেন। খবর আসে, কুমিল্লার চান্দিনায় এখনও এই তাঁতিরা রয়েছেন। তাঁরা খদ্দরের জন্য চরকায় মোটা সুতা কাটেন। তবে সেই সুতা কাউন্টের মাপেই আসে না। তা সর্বোচ্চ আট-দশ কাউন্টের হতে পারে। তবু গবেষকেরা সেখানেই ছুটে যান। তাঁরা ভাবেন, এমন তো হতে পারে যে তাদের পূর্বপুরুষদের কেউ মসলিন সুতা কেটেছিলেন। বহুদিন ঘোরাঘুরির পর তাঁরা হাসু ও নূরজাহান নামের অশীতিপর দুই বৃদ্ধার সন্ধান পান। তাঁরা বলতে পেরেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষেরা মসলিন সুতা কাটতেন। তাঁদেরও ছোটবেলায় মিহি সুতার স্মৃতি রয়েছে। তাঁদের পেয়ে গবেষকদল যেন সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে আশার আলো দেখেন। কিন্তু তাঁরা তো এখন সুতা কাটতে পারেন না।

মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরা খদ্দরের মোটা সুতাকাটুনিদের নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের পাঁচজন করে আটটি দলে ভাগ করেন। প্রতিটি দলের মধ্যে সুতা চিকন করার প্রতিযোগিতা করা হয়। প্রতিটি দলের সেরাদের নিয়ে আবার দল গঠন করা হয়। এভাবে ছয়জন সেরা সুতাকাটুনি বের করতেই তাঁদের দুই বছর সময় লেগে যায়। এই ছয়জনই প্রশিক্ষক হয়ে গেছেন। তাঁদের একজনকে দিয়ে আরও ১১জনকে শেখাতে সময় লেগেছে মাত্র ছয় মাস। এ রকম ১০০জন তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা কাজ করেন। নতুন করে এই সুতা কাটার জন্য চরকা তৈরি করেন মঞ্জুরুল ইসলাম ও টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক আলীমুজ্জামান।

তিন আঙুলের জাদু

সুতা মিহি করার ব্যাপারটা আসলে তিন আঙুলের জাদু। তিন আঙুলে কীভাবে তুলা ছাড়তে হবে, সেটাই আবিষ্কার করতে হয়েছে। আর নারীদের আঙুলেই এই সুতা সবচেয়ে মিহি হয়। তিনটি আঙুলকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নরম করে রাখতে হয়। প্রথমে তাঁদের আঙুলগুলো শক্ত ছিল। অনুভূতি ছিল না। পরে তাঁদের আঙুলের 'ট্রিটমেন্ট' করতে হয়েছে। সন্ধ্যারাতে তিনটি আঙুলে লোশন মাখিয়ে রেখে সকালে সুতা কাটা হত। আর সব সময় আঙুল তিনটির যত্ন নিতে হয়েছে। যাতে এই তিন আঙুলে কোনও আঁচড় না লাগে বা এই তিনটি আঙুল দিয়ে অন্য কোনও জিনিস কাটাকুটির কাজ ওরা না করে।

আবার কখনও কাজ করতে গেলে আঙুল ঘেমে যেত, তখন আবার পাউডার দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হত। আর চারকার এক ফাঁকে তাঁরা কতটুকু সুতা ছাড়বেন, এ ব্যাপারে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একাগ্রতা তৈরি করা হয়েছে। তাঁদের মনোযোগ বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। এটা বড় একটা ব্যাপার। কারণ, এর যান্ত্রিক কোনও মাপ নেই। সম্পূর্ণ মনোযোগের মাধ্যমেই চরকার ঘূর্ণনের সঙ্গে সুতা ছাড়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, 'একটা ভরসা ছিল যে আমাদের দেশে জামদানি তৈরি হয়। জামদানিতে ১৫০ কাউন্টের সুতা লাগে। জামদানি আসলে নিম্নমানের মসলিন। এ জন্য আশাবাদী হয়েছিলাম কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ৩০০ কাউন্টের সুতা নিয়ে তাঁতিদের দুয়ারে দুয়ারে আমরা ঘুরেছি। তাঁরা বলেছেন, এটা সম্ভব নয়। খামাখা এগুলো নিয়ে ঘুরছেন। কিন্তু আমরা হাল ছাড়িনি। একপর্যায়ে আমরা নারায়ণগঞ্জে সেই কাঙ্ক্ষিত তাঁতিকে পেয়ে যাই। তাঁরা হচ্ছেন রুবেল মিয়া ও মো. ইব্রাহিম।'

বুনোন-পূর্ব প্রস্তুতি

চিকন সুতা। ঘর্ষণ থেকে ক্ষয় রোধের জন্য মাড় দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু গতানুগতিক মাড়ে কাজ হচ্ছিল না। একপর্যায়ে তাঁরা চিকন ধানের খইয়ে মাড় ব্যবহার করে কাজ করতে সক্ষম হন। আবার মাড় দিয়ে নাটাইয়ে জড়াতে গিয়ে বারবার ছিঁড়ে যায়। কীভাবে করলে ছিঁড়বে না, সেটাও বের করা হল। শুকানো হল। ববিনে ভরতে গেলেও বারবার ছিঁড়ে যায়। প্রতিটি পদক্ষেপই নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়েছে। টানা তৈরি করতে গিয়েও একই অবস্থা।

বিমের মধ্যে সহজভাবে যাতে ববিন ঘুরতে পারে, এ জন্য কাঠামোগত দিকটা ঠিক করে নিতে হয়। এই চিকন সুতা দিয়ে বিমে জড়ানো ও সানা করতে হয়েছে। চিকন সুতার কারণে আঙুলে লেগেই সুতা ছিঁড়ে যায়। আধা ঘণ্টার কাজ চার ঘণ্টা ধরে করতে হয়েছে। বেশি শীতেও হয় না বেশি গরমেও হয় না। মাটির গর্তে তাঁত বসিয়ে করা হয়। মাটির আর্দ্রতার সঙ্গে মসলিনের একটা সম্পর্ক আছে। সুতা বারবার ছিঁড়ে যাওয়া রোধ করার জন্য বালতিতে পানি রেখেও কাজ করতে হয়েছে।

অবশেষে বোনা হল

এই দুই তাঁতিকে কাপড় বোনাতেও ধাপে ধাপে অনেক কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে। প্রথমে একটি তাঁত করা হয়েছিল। পরে তিনটি করা হয়েছে। এই তাঁতেই রুবেল ও ইব্রাহিম ১৭১০ সালে বোনা শাড়ির নকশা দেখে হুবহু একটি শাড়ি বুনে ফেলেন।

লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে প্রায় সাড়ে তিনশো ঢাকাই মসলিন শাড়ি সংরক্ষিত আছে। সেখানেই রয়েছে ১৭১০ সালে বোনা সেই শাড়িটি। প্রথম অবস্থায় শাড়িটি তৈরি করতে খরচ পড়েছে ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। গবেষকদের প্রত্যাশা, এই খরচ আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। ইতিমধ্যে তাঁরা মোট ছয়টি শাড়ি তৈরি করেছেন। একটি শাড়ি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের পরিচালক আইয়ুব আলী আশা করছেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে এই শাড়ি সর্বসাধারণের জন্য বাজারে আনা সম্ভব হতে পারে। প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৪ কোটি ১০ লাখ টাকা। ছয় বছরে ব্যাপক ঘোরাঘুরি, কলকাতা-লন্ডন করেও খরচ হয়েছে সোয়া ৪ কোটি টাকার মত। বরাদ্দের অবশিষ্ট প্রায় ৭০ শতাংশ টাকা সরকারের খাতে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে হারিয়েছিল ঢাকার মসলিন

এখানে উল্লেখ্য যে, মসলিনের সুতা কাটা থেকে শুরু করে কাপড় বোনা পর্যন্ত প্রতি ধাপেই অধিকাংশ কর্মী ছিলেন ঢাকার নারীরা, বিশেষত তরুণী নারী।। ১৭১৫-১৬ সালের দিকে সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরে গেলেও শিল্পনগরী হিসেবে ঢাকা তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছিল। ঢাকায় তখন শুরু হয় নায়েবে নাজিমের শাসন। এসময়ে ঢাকার অধিকাংশ অধিবাসী থাকতেন বুড়িগঙ্গার ধারে। তবে উত্তরে বিচ্ছিন্নভাবে টঙ্গি পর্যন্ত জনবসতি ছিল। আর মসলিন ব্যবসার লাভের কারণে ইউরোপীয় বণিকেরা তাদের ফ্যাক্টরি বা কুঠি বসিয়েছিলেন ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়। এসময় ইংরেজ কুঠি ছিল তেজগাঁও এলাকায়।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার দুর্ভাগ্যজনক পরাজয় ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ এই মসলিন শিল্পকে চরমভাবে প্রভাবিত করে। এই প্রভাবের শুরুটা ছিল পরোক্ষ এবং খানিকটা ধীরে। তবে বিলাতের শিল্পবিপ্লব ও ইংরেজ কূটকৌশলে ১৮ শতকের শেষভাগে গিয়ে মসলিন দ্রুত তার বাজার হারাতে থাকে। সিরাজের পরাজয়ের পর ইংরেজরা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। এরফলে ঢাকার নায়েবে নাজিম জেসারত খান সহ বহু মুঘল অমাত্য ইংরেজদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। আর্থিক ক্ষমতার পাশাপাশি নায়েবে নাজিমের প্রশাসনিক ক্ষমতাও লোপ পায়। ইংরেজ ল্যাফটেনান্ট সুইনটন জেসারত খানের সঙ্গে একসঙ্গে বসে ঢাকার শাসন কাজ চালাতে শুরু করেন। বাংলা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যে রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস। এটা হাতাছাড়া হওয়ায় মুঘল সম্রাট, তার সভাসদ ও পরিবারবর্গের ক্রয়ক্ষমতাও বহুলাংশে কমে যায়। প্রধান ক্রেতার এহেন দশায় মসলিন হারাল তার অভ্যন্তরীণ বাজার। অভ্যন্তরীণ বাজারের সংকোচনে কর্মহীন হল বহু মসলিন তাঁতি আর এর ফুটি তুলার চাষীরা। এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার কর্মচারীদের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিল। তারা মেতে উঠল কালোবাজারি, মজুদদারিতে। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হল আকাশ ছোঁয়া। একদিকে কর্মহীন জীবন, অন্যদিকে উচ্চ দ্রব্যমূল্য–

ফলাফল বাংলা ১১৭৬ এর মন্বন্তর, এ দুর্ভিক্ষে শুধু বাংলাতেই অনাহারে প্রাণ যায় ৩০ লক্ষ নর-নারীর।

১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মসলিনের বিক্রি মুঘল সাম্রাজ্যে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকলেও ইউরোপের বাজারে তখনও টিকে ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হল, ১৭৮০ তে বিলাতের শিল্প বিপ্লব মসলিন তাঁতিদের ঐ শেষ আশ্রয়টাও ধ্বংস করে দেয়। প্রাথমিকভাবে যন্ত্রে তৈরি ম্যানচেস্টারের ওসব মোটা কাপড়ের কোনও ক্রেতা ইংরেজরা বিশ্ববাজারে পাচ্ছিল না। ঢাকায় তৈরি হাতে বোনা মসলিনের অনবদ্যতায় মুগ্ধ ক্রেতারা কেউই সেইসব মোটা বিলাতি কাপড় কিনতে রাজি ছিল না। এক্ষেত্রে ইংরেজরা যথারীতি কূটকৌশলের আশ্রয় নিল। বিলাতে ঢাকা থেকে আমদানিকৃত মসলিনের উপর তারা শতকরা ৭০-৮০ ভাগ কর বসাল। অপরদিকে নিজেদের যন্ত্রে বোনা মোটা কাপড়ের উপর থেকে সবরকম কর কমিয়ে ইউরোপের বাজার এমনকি ভারতের বাজারেও ঢুকবার চেষ্টা চালাতে থাকল। পত্রপত্রিকায় চলল মসলিন নিয়ে নানান অপপ্রচার, মসলিনকে হেয় করে ছাপাতে লাগল নানা রকম ক্যারিকেচার। শুধু তাই নয়, কথিত আছে, দেশীয় তাঁতিরা যাতে মসলিন বোনার কৌশল পরবর্তী প্রজন্মকে শেখাতে না পারে সেজন্য তাদের হাতের আঙুলও কেটে ফেলেছিল স্থানীয় ইংরেজ বণিকরা। এর প্রভাবে মসলিন রপ্তানি হ্রাস পেল ব্যাপকভাবে। ১৭৫৩ সালে পলাশীর যুদ্ধের আগে যেখানে বছরে শুধু মসলিনই রপ্তানি হয়েছিল তখনকার হিসেবে ২৮ লক্ষ টাকার বেশি, ১৮০০ সালে সব ধরনের মিলিয়ে রপ্তানি হয় ১৮ লক্ষ টাকার বস্ত্র যার মধ্যে মসলিন ছিল একটি ক্ষুদ্র অংশ। এরপর বছরে গড়ে ৬ লক্ষ টাকার বস্ত্র বাংলা থেকে রপ্তানি হত বিলাতে। এভাবে ইংরেজ কূটকৌশল আর অত্যাচারের শিকার হয়ে ১৯ শতকের মাঝামাঝিতে পুরোপুরিই বিলুপ্ত হয়ে যায় ঢাকার মসলিনশিল্প।

বাংলার মসলিন শিল্প তার সোনালি সময়ে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ, কার্পাস উৎপাদন থেকে শুরু করে বিক্রি– পুরো চক্রটা ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। ঢাকার আশেপাশে চাষ হত ফুটি কার্পাস। এই ফুটি কার্পাসকে কোনও কোনও ইতিহাসবিদ পৃথিবীর সেরা জাতের কার্পাস বলে ধারণা করেন। এই কার্পাস চাষাবাদেও ছিল নানা ধরনের নিয়মকানুন। কার্পাসের বীজ বছরে দুইবার বপন করা হত, শরৎ এবং বসন্তকালে। বসন্তকালের কার্পাস থেকে উৎপাদিত তুলাকে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মনে করা হত। সাধারণত মসলিন তাঁতিদের কেউ কেউ নিজের জমিতে কার্পাসের চাষ করতেন, অনেকেই চুক্তি ভিত্তিতে নিজের জমিতে কার্পাস চাষ করে মসলিন তাঁতিদের কাছ থেকে দাম বুঝে নিতেন। ভাল ফসল হলে বিঘাপ্রতি দুই মণ কার্পাসের ফলন পাওয়া যেত।

এরপর কার্পাস থেকে তুলা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া, বীজসহ কার্পাসকে বোয়াল মাছের চোয়ালের দাঁত দিয়ে বানানো চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে তুলা থেকে অপদ্রব্য আলাদা করে নেওয়া হয়। এই কাজে দরকার দক্ষতা আর ভীষণ ধৈর্য। খুব ছোটবেলা থেকেই পারিবারিকভাবে তাঁতিদের সন্তানদের হাতেখড়ি হত এসব কাজে, ফলে পরিণত বয়সে এসে তারা খুবই দক্ষ হয়ে ওঠে।

এরপর তুলা থেকে সুতা কাটার কাজ শুরু হয়, এই কাজটি সাধারণত পরিবারের নারী সদস্যরা করতেন। শুকনো বাতাস বইতে থাকলে সুতা কাটা সম্ভব নয়, সূক্ষ্ম সুতা কাটার জন্য বাতাসে আর্দ্রতা দরকার। তাই খুব ভোর থেকে শুরু করে সকালের রোদ ওঠার আগে এবং বিকালে সূর্যাস্তের আগের সময়ে সুতা কাটার কাজটি করা হত, এমন জনশ্রুতিও আছে আর্দ্র বাতাসের জন্য নদীতে ভাসমান নৌকায় সুতা কাটার কাজ করা হত। সুতা কাটায় সূক্ষ্মতার জন্য দুটি গুণের দরকার ছিল, একটি প্রখর দৃষ্টিশক্তি, অন্যটি হাতের আঙ্গুলের প্রখর চেতনা শক্তি।

সূত্র: ইন্টারনেট ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম

ঘ ট না প ঞ্জি ❖ জা নু য়া রি

০১ জানুয়ারি ১৮৯০ ❖ প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৮৯৪ ❖ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯০৩ ❖ জসীমউদ্‌দীনের জন্ম
০১ জানুয়ারি ১৯১৪ ❖ অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম
০২ জানুয়ারি ১৯১৭ ❖ শওকত ওসমানের জন্ম
০৮ জানুয়ারি ১৮৮৪ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু
০৮ জানুয়ারি ১৯০৯ ❖ আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম
১০ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৮৬৩ ❖ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম
১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ ❖ মাস্টারদা সূর্য সেনের ফাঁসি
১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ ❖ মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯০১ ❖ সুকুমার সেনের জন্ম
১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ ❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯০৫ ❖ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু
১৯ জানুয়ারি ১৯৩৫ ❖ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৩ জানুয়ারি ১৮৯৭ ❖ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম
২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তর জন্ম
২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ❖ প্রজাতন্ত্র দিবস
২৯ জানুয়ারি ১৯৭৬ ❖ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মৃত্যু
৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ ❖ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম
৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ ❖ মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ॥ শহীদ দিবস

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

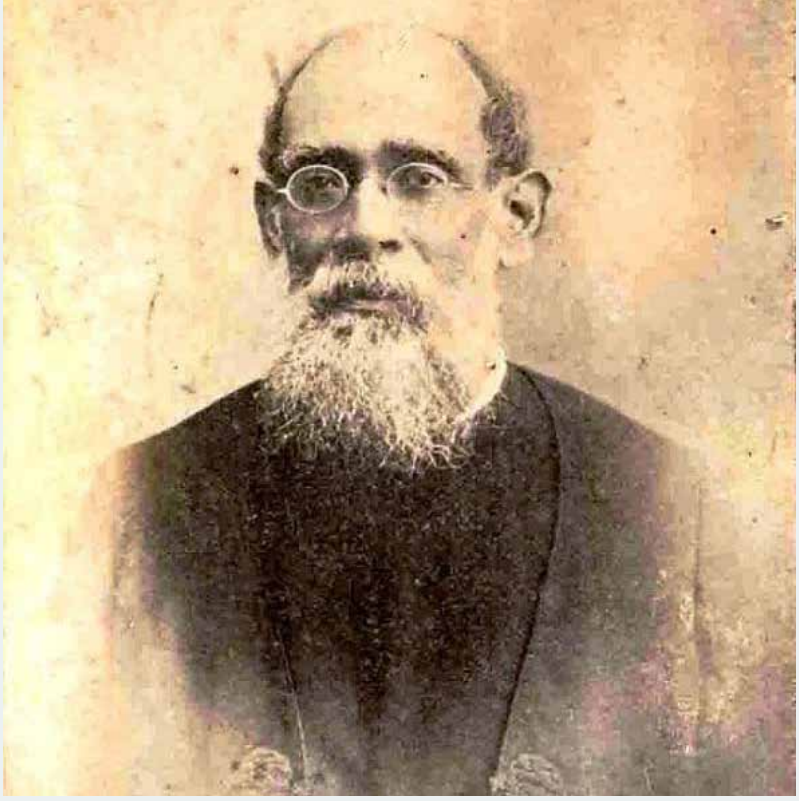

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা জানুয়ারি ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি ভারতীয় উপাচার্য হিসেবে কার্যভার গ্রহণকারী একজন কলকাতা হাইকোর্টের বাঙালি বিচারপতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন তিন বছরের জন্য– ১লা জানুয়ারি ১৮৯০ সাল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৯২ সালে পর্যন্ত। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতার নারকেলডাঙার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। মাতা সোনামণি দেবী ধর্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন। তিন বৎসর বয়সে গুরুদাস পিতৃহীন হলে অসহায় জননীর স্নেহচ্ছায়া ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। প্রথমে ভর্তি হন ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ও পরে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে (হেয়ার স্কুলে)। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হন। স্কটিশ চার্চ কলেজ ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্নাতক হন। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর (এমএ) হন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে আইন পরীক্ষাতেও সর্বোচ্চ স্থান অর্জন করেন। পরের বছরে ল' অনার্স পাশ করেন।

শিক্ষান্তে প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং গণিতের অধ্যাপক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। এখানে কর্মরত অবস্থাতেই বহরমপুর কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ হয়। বহরমপুরে অবস্থানকালে ওকালতিও শুরু করেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন জননীর আগ্রহে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ডিএল উপাধি পান এবং পরের বছরেই বিচারপতির পদ লাভ করেন। ষোল বছর তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হয়েছিলেন।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও আইন পরীক্ষক ও তিন বৎসর জন্য সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। এ সময় তিনি পরীক্ষা পরিচালনা ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পদ লাভ করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য ও ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ল' ফ্যাকাল্টির ডিন হন।

শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা পরিচালনা ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ছাড়াও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উৎসাহী কর্ম হওয়ার সুবাদে বহু অবদান রেখে গেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁর প্রভূত অবদান ছিল। আমৃত্যু তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার চর্চা আবশ্যিক ও বাংলা ভাষার সকল শিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টায় তাঁর বিপুল অবদান ছিল। দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনায় অগ্রণী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে কায়িক শ্রমের কাজেও লিপ্ত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় সরকারি হস্তক্ষেপের তিনি নিন্দা করেন, এমনকি সক্রিয়ভাবে বাধাও দেন। স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়েও তিনি ছিলেন সমানভাবে আগ্রহী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও ভারতীয় বিজ্ঞানউৎকর্ষিণী সভার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় পরোক্ষভাবে তিনি রাজনীতিকদের সাহায্য করতেন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সভায় তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা। তাঁর বক্তব্য রাজনীতিকদের প্রভূত সাহায্য করেছিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল

জ্ঞান ও কর্ম, *'শিক্ষা, এ পিউর থটস অন এডুকেশন*, *দ্য এডুকেশন প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া*, *হিন্দু ল' অফ ম্যারেজ অ্যান্ড স্ত্রীধন*। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অধ্যাপক হিসাবে প্রদত্ত বক্তৃতা পরে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত।

● সংকলিত

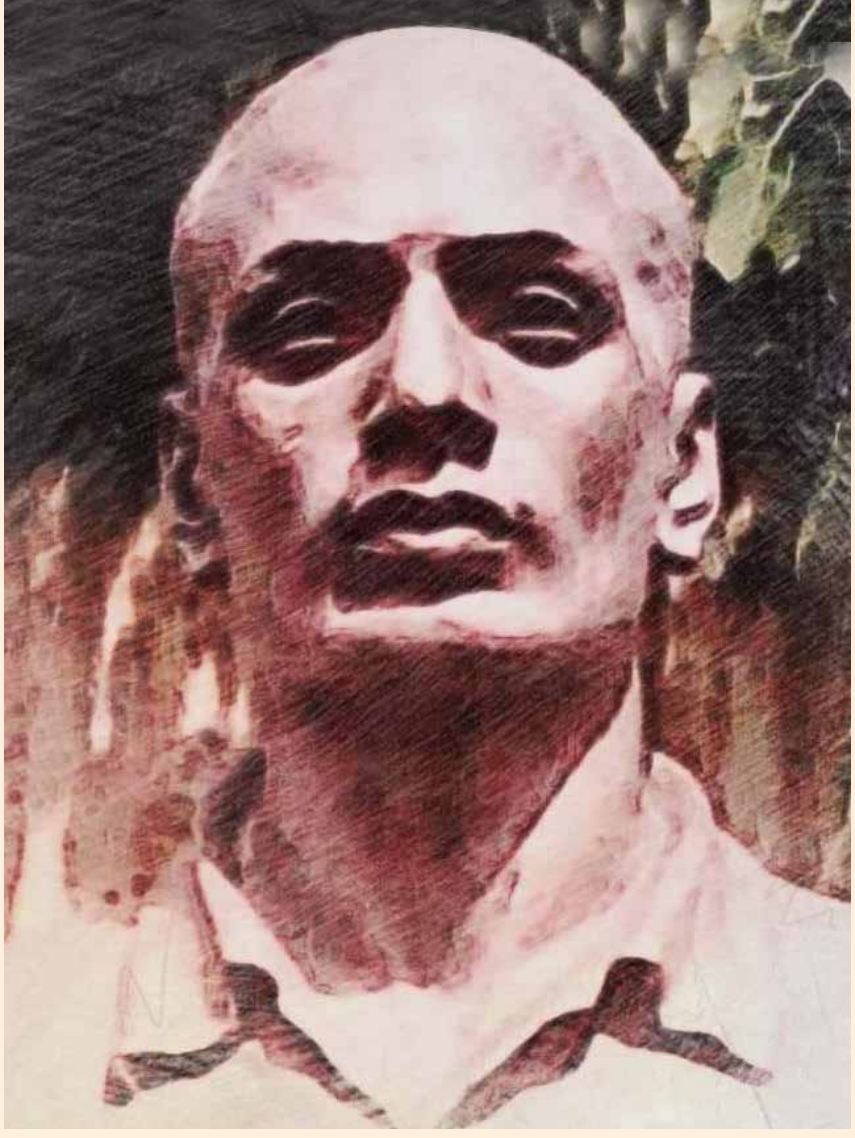

ইতিহাস

মাস্টারদা সূর্য সেন

বাবা রাজামণি সেন, মা শশিবালা দেবী। ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ তাঁদের ঘরে জন্ম নেন তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র 'কালু', বরাবর রোগাপাতলা বেঁটেখাটো চেহারা, ভাল নাম 'সূর্যকুমার সেন'। কোন সময়ের মধ্যে বেড়ে উঠছেন তিনি, দেখা যাক। তাঁর জন্মের একবছর আগে এক বীর সন্ন্যাসী জগৎ টলিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে একদিন তাঁর সেই ভাবগুরু স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনের দিন তাঁর শেষ দিন হবে। কংগ্রেস তখন একটা বড়লোকদের মেশার জায়গা, সভায় যেখানে ইংরেজি বক্তৃতা হয়, সাধারণ মানুষ দূরে দূরে থাকে। সূর্যকুমার যখন একটু বড় হয়ে উঠছেন, নিবেদিতা তখন বাংলার মাটিতে পা দিয়েছেন। যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁর বাবা পরলোক গমন করেন। ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে অনুশীলন সমিতি, কলকাতা ও ঢাকায়; ইহলোক ত্যাগ করেছেন তাঁর ভাবগুরু। আর একটু বড় হচ্ছেন তখন শুরু হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলন। তাঁর যখন তেরো-চোদ্দ বয়স তখন প্রফুল্ল চাকী আত্মবলিদান ও ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়েছে, শুরু হয়েছে মুরারীপুকুর মামলা। ১৯১৩ সালে সূর্য কুমার প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন, সেই বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পান। তার আগের বছরে দিল্লিতে গিয়ে বোমা ছুঁড়ে এসেছেন রাসবিহারী বসু, আর পরের বছর শুরু হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১৯১৫ সালে সূর্য সেন প্রথম বিভাগে এফএ পাস করেন। সেই বছরই ভারতব্যাপী দ্বিতীয় সেনা বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়, প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধে বাঘা যতীন প্রাণত্যাগ করেন, রাসবিহারী বসু ভারত থেকে জাপান যাত্রা করেন।

১৯১৫ সালে তিনি প্রথম বিভাগে এফএ পাস করেন। সেই বছরই ভারতব্যাপী দ্বিতীয় সেনা বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়, প্রথম সামনাসামনি যুদ্ধে বাঘা যতীন প্রাণত্যাগ করেন, রাসবিহারী বসু ভারত থেকে জাপান যাত্রা করেন।

সূর্য সেন বিএ পড়তে আসেন বহরমপুরে। বিএ পড়ার সময়েই তৈরি করেছিলেন গুপ্ত দল, সঙ্গী ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। বিএ পাসের পরে চট্টগ্রামে ফিরে এসে উমাতারা হাইস্কুলে অঙ্ক শিক্ষকের চাকরি নেন। এই স্কুলেই স্বল্পভাষী তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক সূর্যকুমার সেন হয়ে ওঠেন সকলের প্রিয় মাস্টারদা। তাঁর তৈরি গুপ্তদলে পরে পরে যোগ দিলেন নির্মল সেন, আফসারউদ্দিন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ; বহু পরে যোগ দিয়েছিলেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯১৯ সালে একরকম জোর করে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়, স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা দেবী। সেই বছর জারি হয় রাউলাট আইন, ঘটে যায় পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। তার আগের বছর শেষ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর পরের বছর শুরু হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন। দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা বলে মাস্টারদা সদলবলে যোগ দেন কংগ্রেস ও আন্দোলনে। আন্দোলনের মাঝপথে পা রাখলেন এক যুবক, সুভাষচন্দ্র বসু। এই সুভাষচন্দ্র বসুই ভবিষ্যতে তাঁকে 'চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস সভাপতি' করবেন।

বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারের জন্ম ১৯০৯ সালে। বাবার নাম চন্দ্রমোহন দস্তিদার, মা প্রমিলাদেবী। বাড়ি বোয়ালখালীর সরোয়াতলী গ্রাম, জেলা চট্টগ্রাম। তাঁর ডাক নাম ছিল ফুটু। সরোয়াতলী স্কুলে পড়ার সময় থেকেই তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। সরোয়াতলী গ্রামে একটি লাইব্রেরি ও একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। গ্রামের স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ করে চট্টগ্রাম শহরের গভর্নমেন্ট কলেজে আইএসসি পড়ার জন্য ভর্তি হন। এই সময় থেকে মাস্টারদার সংস্পর্শে তাঁর বিপ্লবী কাজের পরিধি আরও বাড়তে থাকে।

নেতা মাস্টারদার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু ছিল না; নেতা হয়ে কখনই কোনও সভায় সামান্য ভাষণও দেননি; চুপচাপ পরিকল্পনা করে কাজকে পরিচালনা করাই ছিল তাঁর স্বভাব। আবার কোনওদিনই কংগ্রেসের আন্দোলনেও আস্থা রাখতে পারেননি মাস্টারদা, বিশেষত গান্ধীর মাঝপথে আন্দোলন বন্ধ করার বদভ্যাসে। তাই কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও তৈরি করেছিলেন 'ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী দল'। এ কাজে মাস্টারদা অবশ্যই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর থেকে প্রায় বছর তিনেক ছোট সুভাষচন্দ্র বসুর ১৯২৮ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের কাজকর্ম থেকে। মাস্টারদা মাত্র আশি/নব্বই জন ছেলেকে নিয়ে তিন/চার দিনের জন্যে হলেও চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন। রক্তে দোলা দিয়েছিল বাঙালির।

১৯৩০ সালের ১৮ থেকে ২২ এপ্রিল, চারদিন ধরে চলে জলালাবাদ যুদ্ধ। ৬ মে হয় কালারপোল সেতুর কাছে জলধা গ্রামে যুদ্ধ। মাঝে প্রায় দুইবছর পুলিশের নজর এড়িয়ে যাযাবরের মত আত্মগোপন, চলে অর্থ সংগ্রহ। ১৯৩২ সালের ৬ জুন হয় ধলঘাট যুদ্ধ। ১৯৩২, ২৪ সেপ্টেম্বর হয় পাহারতলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি (মতান্তরে ২ ফেব্রুয়ারি) মাস্টারদা ছোট্ট এক ভুলে ধরা পড়ে যান। মাস্টারদা গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রায় তিন মাস তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম বিপ্লবী সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। জেল ভেঙে মাস্টারদাকে উদ্ধারের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু তার আগেই ১৮ মে গহিরা যুদ্ধে বন্দি হন তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত। এরপর বিচারে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির আদেশ হয়। হাইকোর্টের আপিলেও ফাঁসির রায় বহাল থাকে। কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। অবশ্য মাস্টারদার বিচার কোনও আদালতে হয়নি, হয়েছিল চট্টগ্রাম জেলের মধ্যেই গোপন এক ঘরে। সেই বিশেষ ট্রাইবুন্যালের বিচারক ছিল তিনজন– মি. ম্যাকসার্পি, ইংরেজ; রজনী ঘোষ, হিন্দু; খোন্দকার আলী তোয়েব, মুসলিম– কি অদ্ভুত!

তারপরেও আর একবার জেল ভাঙার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যদিও তা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৩ সালের ১২ জানুয়ারি মেদিনীপুর ছেলে ফাঁসি হয় প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য নামে উনিশ পেরনো এক যুবকের। ঠিক তার পরের বছর ১১ জানুয়ারি বেলা বারোটা থেকে পরের দিন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সারা চট্টগ্রাম শহরে কারফিউ জারি হল। ১৯৩৪ সালের ১১ জানুয়ারি মধ্যরাতে ইংরেজি মতে ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন ও বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদারকে নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচার করার পরে ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ফাঁসির আগে ও পরে খবর গোপন করা হয়, শেষকাজের জন্য শরীর আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। ঘটনার দুইদিন পরে মাস্টারদার ছোটভাই কমল সেন জেল ম্যাজিস্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর 'ভারত বিখ্যাত' দাদার ফাঁসি হয়ে গেছে। সেদিন কি ঘটেছিল, প্রথমে তা জানা যায়নি। বহুপরে সেই জেলে থাকা কিছু প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে সেই রাতের ঘটনা জানা যায়।

ফাঁসির কিছু সময় আগে রাত দশটা নাগাদ আটজন ব্রিটিশ সেনা জেলের মধ্যে ঢোকে। এরপর তারা ঘুমন্ত মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে হাত-পা বেঁধে দেয়, তারপর নির্মমভাবে হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকে। হাতুড়ি দিয়ে মুখ থেঁতলে দেওয়া হয়, ভেঙে দেওয়া হয় দাঁত। হাত-পায়ের নখ উপড়ে তুলে ফেলা হয় একটা একটা করে। হাঁটু থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরের প্রতিটা জয়েন্টে চলে নির্বিচারে আঘাতের পর আঘাত। শরীরের সকল হাড় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তাঁরা নিস্তেজ হয়ে জ্ঞান হারান। তারপর মৃতপ্রায় শরীর দুটিকে টানতে টানতে, তাঁদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় ফাঁসির দড়ি। তার পরেও মৃত্যু নিশ্চিত করতে জেলখানা থেকে ট্রাকে করে স্টিমার ঘাটে নিয়ে গিয়ে তাঁদের বুকে বেঁধে দেওয়া হয় লোহার বড় বড় চাঁই। জাহাজ চলে যায় বঙ্গোপসাগরের মাঝের এক গভীর অংশে। অতল গভীর জলে তাঁদের ফেলে দেওয়া হয়। কী নিষ্ঠুর নির্মমতা!

● নিজস্ব প্রতিবেদন

শিশুতীর্থ

ধা রা বা হি ক

ক্ষীরের পুতুল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন, দীঘির জলে নেয়ে, রেঁধে-বেড়ে খেয়ে তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল না। গাঁয়ের বৌ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারাদার হাঁকিয়ে দিলে।

সেদিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকুরণের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকুরুণ খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুণের মুখে জলবিন্দু পড়ল না, ঠাকরুণ কাঠামোর ভিতর ছটফট করতে লাগলেন, ঠাকরুণের কালো বেড়াল মিঁউ-মিঁউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে-মনে ফন্দি এঁটে পাল্‌কির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ভাবলেন– আঃ আপদ গেল! কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যর ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে-খুঁজতে দেখেন, পাল্‌কির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুণ আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে-মনে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগ্‌নগরে যখন দিন ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগ্‌নগরে ষষ্ঠীরদাস ষেঠের-বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে, সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুণের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগ্‌নগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন– ঠাকরুণ, দিন-দুপুরে ডেকেছেন কেন?

ঠাকরুণ বললেন– বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে যে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলে, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগ্‌নগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন– জেগে রইল গাঁয়েব মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দীঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানীর বানর। আর জেগে রইল, ষষ্ঠীরদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদ্‌বেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগ্‌নগহরে দীঘির ঘাটে বরযাত্রীদের ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে-ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে– ঠাকরুণ, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুণ ভয় পেয়ে বললেন– আঃ মর! এ মুখপোড়া বলে কি! সর সর, আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে!

বানর বললে– তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব। নয়তো কাঠামোসুদ্ধ আজ তোমায় দীঘির জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুণ লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন– বাছা চুপ কর, কে কোন্ দিকে শুনতে পাবে? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি, ফিরে পাব কোথা? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুওরানী তাকে আপনার ছেলে মত দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে– কই ঠাকরুণ, বটতলায় তো ছেলেরা নেই! আমায় দিব্যচক্ষু দাও, তবে তো ষষ্ঠীরদাস ষেঠের বাছাদের দেখতে পাব! ষষ্ঠীঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে– ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে– ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে-স্থলে, পথে-ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুম্‌ঝুম্ করছে, কেউবা পায়ের নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনও ছেলে রোগারোগা, কোনও ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টক্‌বক্ হাঁকাচ্ছে, একদল দীঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল গাছের তলায় ফুল কুড়চ্ছে, একদল ডালে ফল পাড়ছে, চারদিকে খেলাধুলো, মারামারি, হাসি-কান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য। সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দীঘির কালো জল, তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ, তারপরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে-গাছে ন্যাজঝোলা টিয়ে পাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁও-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন! নদীর পারে জম্ভীগাছটি তাতে জম্ভী ফল ফলে, সেখানে নীলে ঘোড়া মাঠে-মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীলে ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে কমলাপুলির দেশে পুঁটুরাণীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়ে পাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে-ঝাঁকে টিয়ে পাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচ্‌মেচ্ করে, আর সে দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে। সে এক নতুন দেশ– সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সেই দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে-গুণতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে! জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে। –এমন সময় টাপুর-টুপুর বৃষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্ পাড়ায় কোন্ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিকচিকে জলের ধারে ঝুরঝুর বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকা বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে– এক কন্যে রাঁধলেন, বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না-পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন; বানর তাঁর সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো-কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দু'পাশে দুই রুই-কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা টিয়ে আসছিল, সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়ারে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে-নাচিয়ে বললেন– ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচ দেখে যায়।

বানর দেখলে– ছেলেটি বড় সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন্ দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিন্‌সে কাহার নিয়ে, চার মাগী দাসী সঙ্গে, আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানীকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে-যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুল গাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে-নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল– দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল!

বানর দেখলে– কোথায় ষষ্ঠীকরুণ, কোথায় কে? বটতলায় দীঘির

ধারে ছেলে কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে! তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পাল্‌কি চড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যাবেলা দিগ্‌নগর ছেড়ে গেল।

এদিকে পাটলি দেশে বেয়াইবাড়ি বসে বসে রাজা ভাবছেন– বানর

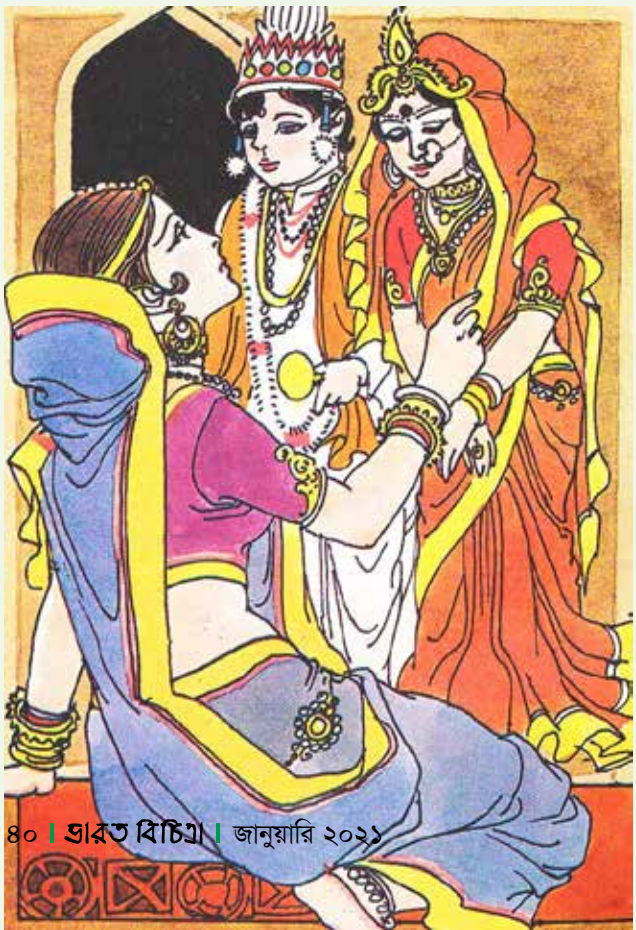

এখনও এল না? আমার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব। বিয়ের কনেটি ভাবছে–না জানি বর দেখতে কেমন? কনের মা-বাপ ভাবছে– আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে। রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে– কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব। এমন সময় গুরু-গুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ-পোঁ বাঁশি বাড়িয়ে, টক্‌বক্‌ ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝক্‌মক্‌ আলো জ্বালিয়ে, বানর বর নিয়ে এল। রাজা ছেলেকে হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে দিলেন, পাড়া-পড়শী বরকে বরণ করলে, দাস-দাসী শাঁখ বাজালে, হুলু দিলে– বর কনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরদিন বৌ নিয়ে, ছেলে নিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। পাটলি দেশের রাজার বাড়ি এক রাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

এদিকে রাজার দেশে বড়রানী দু'দিন দু-রাত কেঁদে-কেঁদে, ভেবে-ভেবে ভোরবেলা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন– ষষ্ঠীঠাকরুন বলছেন, রানী, ওঠ্‌ চেয়ে দেখ, তোর কোলের বাছা ঘরে এল। রানী ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে– ওঠ গো রানী ওঠ, পাটের শাড়ি পর বৌ-বেটা বরণ করগে!

রানী পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বৌ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষীরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্য ভেবে-ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বৌকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশশো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটরানী বুক ফেটে মরে গেল। • সমাপ্ত

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসামান্য শিশুতোষ লেখক ব্রিটিশ ভারতের কুশলী চিত্রকর

উপন্যাস

ধা রা বা হি ক

কেউ কেউ পায়

অনিন্দিতা গোস্বামী

[পূর্ব প্রকাশিত-র পর]

আলো জ্বলে উঠেছিল মেয়েটির মস্তিষ্কে, তথাস্তু, ঠিক, ছেলেটির নাম ছিল তথাস্তু।

সে অতি সঙ্কোচে বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

হ্যাঁ বলুন।

আচ্ছা আপনিই কি টি কে স্যার?

হ্যাঁ! হালকা হাসল ছেলেটি।

ও! সেদিন না আমি খুব কনফিউসড হয়ে গেছিলাম। আমি ভাবছিলাম আমি যাকে চিনতাম সে তো কোনও স্যার ট্যার ছিল না আর তার তিন অক্ষরের একটা ছোট্ট নাম ছিল। তা বেশ ভালই হল, নতুন নামে নতুন করে পরিচয় হল।

এবার বেশ একটু জোরেই হাসল ছেলেটি, বলল আমার কিন্তু ঐ পুরনো নামটাই বেশি পছন্দ। প্রহেলিকা লজ্জা পেয়ে কোনও উত্তর করতে পারল না, শুধু বলল ক্লাস সিডিউল চেঞ্জ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা আমি কি খুব বেশিক্ষণ ধরে ওদের কথা বলছি? টেবিল নাম্বার উনিশ। তা বলতেই পারি। ওদের কথা বলতে আমার ভাল লাগছে। সৃষ্টিকর্তার এটাই তো মজা, তাঁর হাতেই আসল জাদুদণ্ডটি থাকে।

তিনি চাইলে যে কোনও অখ্যানকে দীর্ঘায়িতও করতে পারেন, আবার চাইলে অতি সংক্ষিপ্ত, আপাতত ওদের উচ্ছ্বাস তিন চারটে টেবিল টপকে ছিটেক আসছে আমার কাছে। আমি মনিটর থেকে চোখ তুলে ওদের দিকে তাকালাম।

এই বাজে বোকা না, তোমার চোখ বলছে তুমি কিছু একটা বলতে চাইছ। বল না। প্লিজ, তথাস্তু অনুনয় করল।

না না না, মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়ছে মেয়েটি, ওর ত্বকের নীচে রক্তের উজ্জ্বল আভা। বল বল, প্লিজ। ঐ যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতা আছে না, বাসস্টপে তিন মিনিট, স্বপ্নে বহুক্ষণ...

তো!

সেইরকম একটা কাণ্ড ঘটেছিল।

হুঁ! কি রকম শুনি। এবার ছেলেটির ত্বকও রক্তিম।

এই না আ আ, বাতাসে হাত ঘোরালো মেয়েটি। আচ্ছা ঠিক আছে, ধরে নেওয়া যাক টেবিলের এ প্রান্তে কেউ নেই। এবার বল।

তাহলে চোখ বুঁজে বলব কিন্তু।

বেশ। স্বপ্নতো চোখ বুঁজেই দেখে লোকে।

দেখলাম কি আমি তখন বেশ ছোট্ট, ছিপছিপে রোগা, তুমিও যুবক। তোমার হাত ধরে আমি গিয়েছি তোমাদের বাড়িতে, একটা উঠোন, উঠোনের তারে কাপড় মেলছে তোমার কোনও একজন খুড়তুতো বোন, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে এ বাবা দাদা আবার কাকে নিয়ে এসেছে দেখো। উঠোন ঘিরে ছোট ছোট পুরনো দালান, লম্বা, সামনের দিকে সামান্য ঝোঁকা ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক, তোমার বাবা, টুক্ টুক্ করে এগিয়ে আসছেন উঠানের কোনাকুনি। তোমাদের উঠান থেকে কয়েক ধাপ সিড়ি নেমে গেছে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে নামছি জলে পা ছোঁয়াব বলে। ছালাৎ ছালাৎ করে ছোট ছোট ঢেউ এসে পড়ছে শেষ ধাপটিতে। এমা না, কেন বলে ফেললাম। কি সব বাচ্চা বাচ্চা ব্যাপার স্যাপার।

তারপর, তারপর? তারপর আর কিছু নেই, ঘুম ভেঙে গেল। লাফ মেরে উঠে পড়লাম ছেলের স্কুলের দেরি হয়ে যাবে বলে। আর মন খারাপ হয়ে গেল।

কেন মন খারাপ হয়ে গেল? স্বপ্নটা দেখলে বলে?

না, স্বপ্নের সঙ্গে মন খারাপের কোনও সম্পর্ক নেই, মন খারাপ আমার সবসময় থাকে। ধুর কেন যে বলে ফেললাম তোমায় স্বপ্নটা। কতবার ভেবেছি বলব কি বলব না। একটু একটু বলতে ইচ্ছে হয়নি এমন না কিন্তু না বলবার দিকেই ভোট পড়েছিল বেশি।

না বললে তো আমি জানতেই পারতাম না।

না জানলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতে শুনি?

হত খুব হত। ও তুমি বুঝবে না। আসলে মাঝে মাঝে তো মানুষের মনের ভেতরটা বেরিয়ে আসতে চায়, তাই না? আমি তো ওপরে কিছু প্রকাশ করিনি। ঘুম ভেঙে উঠে দৌড়ে চলে গেছিছেলের টিফিন গোছাতে, রান্নাবান্নার তদারকি করতে। মনটাও কি মেরে ফেলব বল?

ঠিক, মাথা ঝাঁকাল ছেলেটি। তথাস্তু। এবার ওরা উঠবে। তোড়জোড় চলছে। ব্যাগ গুছোচ্ছে। ওরা বেরিয়ে গেল। এবার ওরা দু'জনে দু'দিকে যাবে। আমি ওদের অনুসরণ করব না। ওদের বক্তিগত জীবন যাত্রায় আমার কোনও উৎসাহ নেই। ওদের গল্পটা শেষ হল না, আবার হয়তো ওরা আসবে কোনওদিন। ওদের টুকরো কথার মধ্যে থেকে সেদিন আবার ওদের চিনে নেব খানিক। আসলে ওদের গল্পটা কোনও গালগল্প নয়, তাই ওদের ধাওয়া করার কোন প্রয়োজন নেই আমার। আমি চাই না ওদের গল্পটা শেষ হোক। প্রত্যেক সম্পর্কেরই নাকি একটা শেষ থাকে। নির্দিষ্ট সময় পেরলে তা নাকি মরে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এমনটাই বলেছিলেন। শুরু ক্লাইম্যাক্স তারপর পরিসমাপ্তি। কিন্তু ওদের সম্পর্কে কোনও প্রজ্বলন নেই তাই ভস্মীভূত অবশেষ পড়ে থাকবার ভয়ও নেই তেমন। ওদের যে বয়সে শুরু হয়েছে সম্পর্ক সে বয়সে এসে দগ্ধ দিনের শেষে জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ। এত পথ চলতে চলতে প্রদাহ তো ওরা কম টের পায়নি জীবনে। তাই আমি চাই, ওরা হাতে হাত রেখে তিরতির করে বয়ে যাক চিরকাল। আমি চাই তবে চরিত্র তো সবসময় লেখকের নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে না ওরা নিজেরাই যেন চলতে শুরু করে আপনমনে। আমার চাওয়াটুকু শুধু ওদের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকুক। সম্পর্ক তো এক রকমের নয়। কত বিচিত্র সম্পর্কের বহু বর্ণচ্ছটায় বর্ণময় হয়ে ওঠে আমার এই ধূসর পাণ্ডুলিপি।

ওরা এলে আমার সম্পূর্ণ মনোযোগটুকু ওরাই নিয়ে নেয়। অন্য টেবিলের দিকে আমি আর তেমন খেয়ালও করি না। দাবার ছকের থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় সকল ঘুটি ঐ রাজা রানি ছাড়া। ওরা চলে গেলেও আমি ওদের ভিতরেই ডুবে থাকি, রূপকথার গল্প লিখব বলে আমি প্রতীক্ষায় থাকি ওদের আর একদিন ফিরে আসার আর আমার চাওয়াটুকুকে সত্যি করে ওরা ঠিক আর একদিন চলে আসে ঐ কোণার টেবিলটায়। ওদের না দেখলে আমি বুঝতেই পারতাম না লেখার আনন্দ কী, জীবনেরও। এক অপূর্ব স্বর্ণালী আভায় ভরে থাকে যেন আমার সমগ্র অন্তরাত্মা।

আট.

আজ মহালয়া। একটি ঠাণ্ডা পানীয়র বিজ্ঞাপন আর মা দুর্গার মুখের কাট আউটের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে আমাদের ফুডকোর্ট। হালকা হলুদ আলো জ্বলছে। ভেতরে সঙ্গে চলছে চণ্ডীপাঠ আর আকাশবাণীর রেকর্ডেড আলেখ্য। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উদাও কণ্ঠে পাঠ, আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জির ধরণীর বহিরাকাশে অন্তর্হিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোর্তিময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা। মাতল রে ভুবন, বাজল তোমার আলোর বেণু। অপূর্ব লাগছে চারিধার। আজ আর কোনও বিশেষ টেবিলে মনোনিবেশ করতে ইচ্ছে করছে না আমার। সকলেই আজ কি খুশি, ঝলমল করছে আজ সকলে। সকলেই প্রায় এসেছে আজ সপরিবারে, পুজোর বাজার সারতে। ফেরার পথে রাতের ডিনার করে যাওয়া। মা বাবা আর ছেলে, স্বামী স্ত্রী আর তাদের ছোট্ট বাচ্চা, মা আর দুই মেয়ে, মা মাসি মেয়ে আর জামাই। সকলেই বেশ ক্লান্ত। আমাদের ফুডকোর্টের বাইরে ছাদের বাকি অর্ধেকটায় গোল করে পাট বসানো পাতকুয়োর ঢঙে নীচের মলে আলো যাবার ব্যবস্থা। তার চারপাশে বাঁশের বাঁধানো বেদি। অন্য কোণে দুটো দোনলা মত বেঞ্চ আর টেবিল সে জাগাটাও ভারী চমৎকার। আমার টি কর্নার থেকে দেখা যায় বাকি ছাদটা। একটা ছোট পান গুমটিও আছে, কী সুন্দর সবুজ টিনের সেড, লোহার খুঁটির সঙ্গে পেঁচিয়ে উঠেছে কৃত্রিম মানি প্লান্ট, সামনের টেবিলে সাজানো রয়েছে লাল হলুদ রাংতা মোড়া কত রকমের মশলা, চকচকে সবুজ পান। খিল খিল করে হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে কিছু অষ্টাদশী পান কিনল।

গোল বাঁশের বেদিটার ওপর আজ অনেক কবুতর কবুতরী, ওরা ঘন হয়ে বসেছে। ঐ জায়গাটা কিঞ্চিৎ ঝুঝকি, একজন ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল আর এক জনের কাঁধে। আমার ঠিক উল্টো দিকের দেওয়ালের কোণে মনিরের বিরিয়ানি থেকে ধোঁয়া উঠেছে পাকিয়ে পাকিয়ে। আজ ওখানেই ভিড় বেশি। ভাতের চুড়োতে বসানো একটা গোটা ডিম জাফরানে রাঙানো।

পুজো এলেই সকলে কত আনন্দ করে। প্রিয়জন প্রিয়জনের কাছে যায়। নতুন জামাকাপড় কেনে। রাস্তার বাঁকে বাঁকে প্যান্ডেলে কাপড় পড়ে। খড়ের কাঠামোয় মাটি পড়ে দেবী মূর্তির। চারিদিকটাই খুশি খুশি। আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। রেল লাইনের দু'ধারে কাশফুল, তবু এ সময়টাই সবচেয়ে বেশি অবসাদ গ্রাস করে আমাকে। এই বিপুল আনন্দের মাঝে আমার নিজেকে কেমন বেমানান মনে হয়।

মা নতুন সার্ট কিনে আনে আমার জন্য। রূপ রণ আমার রিং টোনে সেট করে দেয় ঢাকের আওয়াজ। তবু, তবু এক অদ্ভুত অন্ধকার আমাকে যেন গলা টিপে ধরে। কিসের আনন্দ আমার? কি আছে আমার আনন্দ করবার মত? আমার হুইল চেয়ার ঠেলে ঠেলে মা ঠাকুর দেখতেও নিয়ে যাবে আমাকে। কখনও বা ওয়াকার, রূপ, রণ আর গাড়ি নিয়ে আমিও বেরবো এদিক ওদিক। অথচ সব সময় মনে মনে ধিক্কার দেব নিজেকে, তোমার লজ্জা করে না? তোমার লজ্জা করে না এ আনন্দযজ্ঞে সামিল হতে? করুণাময় ঈশ্বর এ তোমার কেমন বিচার! এত বড় একটা জীবন আমি পার করে দিলাম তবু তুমি আমাকে এমন একটা দিন উপহার দিলে না যে দিন আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারি! আমার সকল লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমান মুছে গিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে আমার এই কিঞ্চিৎকর জীবন। আমার যা কিছু লেখা বেশির ভাগই সন্ধ্যেবেলা। দিনের আলোয়

আমার লিখতে ইচ্ছে করে না। কখনও-সখনও বিশেষ কোনওকিছু নজরে না পড়া পর্যন্ত। দিনের বেলা আমি শুধু বসে বসে দেখি। দিনের বেলা স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা বেশি আসে। গোল করে বসে, হৈ হৈ করে। মহালয়া মানে ছুটির দিন। তারা তাই উধাও। এসেছিল কিছু হাত ধরা প্রেমিক প্রেমিকা। তারা চাউমিন, পিৎসা খেয়ে উঠে গেছে। মনে রাখবার মত কিছু রেখে যায়নি বাতাসের সরল রেখায়। আমি কিন্তু যা দেখি তাই লিখতে পারি না, যা আমার মস্তিষ্কে বার্তা পাঠায় না তা আমি লিখতে পারি না। ভাবছিলাম সাট ডাউন করে রেখে দেব। ত্রিধারার কথা মনে পড়ছিল খুব। গুমরে গুমরে উঠছিল ভেতরে কান্না। মনে পড়ছিল বাবার কথাও। কেমো নেবার পর বাবার মাথার চুলগুলো সব পড়ে গিয়েছিল তাই বাবা মাথায় একটা টুপি পরে দোকানে বসত, রোগা, কোলকুজো। বাবা যখন চলে গেল, কোনও অসুবিধায় আমাদের ফেলে যায়নি, তার আগেই সব বন্দোবস্ত করে রেখে গেছিল। তার ত্রিধা আমার লজেনচুস বন্ধু, প্রতিদিন ব্রেক পিরিওডে টিফিন কৌটো খুলে আমাকে স্যান্ডুইচ খাওয়াত, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন বুঝে গেল, করুণা আর ভালবাসা এক জিনিস নয়। এমন খুশির দিনেই তো ও আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল সপ্তমীর দিন ঠিক সন্ধ্যে সাতটার সময় ও অনামিত্রর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে আসবে আমাদের পাড়ায়। আমি যেন প্যান্ডেলে থাকি, আমার সঙ্গে ও আলাপ করিয়ে দেবে অনামিত্রর। রিজারভেশন, শব্দটাকে ঘেন্না করি আমি, আমার জন্য একটা সংরক্ষণ চালু ছিল সরকারি দপ্তরে সেটাকে কাজে লাগিয়ে চাকরির চেষ্টা করব আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দয়া, দয়া, দয়া আর কতদিন দয়া নিয়ে বাঁচব? কি দেখাবে ত্রিধা আনামিত্রকে? সি ইজ হাউ মাচ্ কাইন্ড হার্টেড, সি ইজ সো কাইন্ড টু ডিস্এবল্ পিউপিল। দয়াও চরিত্রমুকুটে একটি পালকসদৃশ। আপ্লুত হবে অনামিত্র, আরও বেশি বেশি করে আদর করবে ত্রিধাকে। আর আমি ত্রিধা মনে করে আঁকড়ে ধরব আমার পোষা মেনি বেড়ালটাকে, অকারণে হাত বুলাব তার দৃঢ় হয়ে ওঠা দীর্ঘ সাদা লেজে! ওসব হবে না। ত্রিধার জন্য আমি শোক পালন করিনি, তবে ত্রিধাকে আর কখনও এনটারটেনও করিনি আমি। বলেছি আমি এখন ব্যবসার কাজে ভীষণ ব্যস্ত। টাটা।

সকালে পিতৃতর্পণের ছবি দেখেছিলাম নেটে। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে অসংখ্য মানুষ তাঁদের পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে। আমার সবকিছুই অক্ষরের মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে। ব্যবসাদার মানুষ বাবা, আজকের দিনে সমস্ত উপার্জনটুকু আমি বাবার নামে তৈরি একটা ফান্ডে জমা করি, যেখান থেকে কোনও আমার চেয়ে আরও আরও অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। যেমন কোনও রেলের হকার কিম্বা ফুটপাতের ফল বিক্রেতা। না দয়া নয়, তারা যেভাবে ইচ্ছে যত দিনে ইচ্ছে সেটা শোধ করে। শুধু হাত বাড়ানো। সহমর্মিতা। সাট ডাউনের আগে তাই হিসাব মিলাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখ আটকে গেলে কোণার টেবিলে। গোলাপী সালোয়ার কামিজ গোলাপি লিপস্টিক, চামেলিবালা রক্ষিত। চোখে ঝক ঝক করছে কাচের কুচি। কানের লতি জুড়ে অসংখ্য দুল। রাম দুই তিন চার মিছিল চলেছে। ঝপ করে ফুড কোর্টের আলো নিভে গেল। আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে গেল আলো, আমি দেখলাম আরিব্বাস এ কাকে দেখছি আমি, কাচের দরজা ঠেলে ঢুকছে প্রহেলিকা আর তথাস্তু। প্রহেলিকার ওপরে চোখ আটকে গেল আমার। রোজকার সাদামাটা পোশাক ছেড়ে কি ঝলমলে দেখাচ্ছে ওকে আজ! মরচে রঙের খোলে কালো রঙের আঁকিবুকি করা রেশম শাড়ি আর কালো ব্লাউজে অপরূপ এই সন্ধ্যাকে একাই রিপ্রেজেন্ট করছে যেন ও। তথাস্তুর সঙ্গেও আজ ঐ ঢাউস ব্যাগটা নেই। আমার প্রায় সামনেই একটা টেবিলে এসে বসল ওরা। এটা আমাকে মা দুর্গার রিটার্ন গিফট মনে মনে দুঃখ করে বলেছিলাম না আজ, আমার জন্য একটু ও আনন্দ নেই কেন বল মা! তাই। ওদের দেখলেই আমার ভেতর পর্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে, আমার মরা জীবনে জোয়ার আসে। প্রাণের আলো।

মুহূর্তের অন্ধকার আতঙ্কে আমাদের ফুডকোর্টটা বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। কয়েকটা খাবারের কর্নারও ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। মহালয়ার রেকর্ডটা আর নতুন করে চালানো হয়নি। সামান্য সময়ের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের পুরো শপিং কমপ্লেক্সটাই। ওরা এত দেরী করে এল কতটুকু সময়ই বা আর বসবে। তবু আজ ওরা শুধু নিজেদের জন্যই এসেছে, শুধু আনন্দের এই ক্ষণটুকুতে ওরা হয়তো বা সামিল হতে চেয়েছে ক্ষণিকের জন্য। আজ ওরা শুধু কফি খাবে। উফ্ কী আনন্দ যে হল আমার তথাস্তুকে বিল কেটে কফিটুকু এগিয়ে দিতে। মনে হল পুরো ফ্রি করে দিই কিন্তু পারলাম না, যদি কিছু মনে করে, কত কিছু যে ইচ্ছে করে কিন্তু সবটুকু কি আর পারা যায়। উৎকর্ণ আমি যেন ইথার তরঙ্গ থেকে শুষে নিতে চাই ওদের কথোপকথন।

বারে আমার বুঝি ইচ্ছে করে না কিছু দিতে, কেবল নিয়ে যাব আমি?

কি নিলে তুমি?

এই যে শান্তি, সহযোগিতা।

বাঃ আর তুমি বুঝি কিছু দাওনি আমায়? তুমি জানো তুমি কি দিয়েছ আমায়? তুমি জানোই না।

থাক খুব হয়েছে, বলে প্রহেলিকা টেবিলের ওপর পড়ে থাকা তথাস্তুর হাতটা তুলে নিয়ে কব্জির ওপর ঝুলে থাকা ওর ঘড়িটা ঘুরাতে লাগল।

আমি জানি এখন ও কি ভাবছে, আমি ওর মনের কথাগুলো একা একাই যেন আওড়াতে লাগলাম। এতবড় চওড়া ডায়ালের ঘড়িগুলো কেমন খবরের কাগজের পাতা জুড়ে এখন অ্যাড দেয়। খুব সুন্দর ঘড়িগুলো। আমার খুব ইচ্ছে করে তোমার জন্য একটা কিনে দিতে। কী সুন্দর চওড়া কব্জিটা তোমার। আমি প্রথম দিন থেকে দেখেছি। অথচ কি করে দেব বল, এত দাম ঘড়িগুলোর, প্রায় দশ হাজার টাকা। জানো আমার স্যালারি একাউন্টের এটিএম কার্ডে টাকা তুললেও মেসেজ চলে যায় আমার স্বামী বরুণের কাছে, কি জানি কি করে এসব হয়। আমি অবাক হয়ে বরুণকে প্রশ্ন করলে ও বলে আমি নাকি এটিএম কার্ডের ফর্ম ফিলাপ করার সময় ভুল করে আমার ফোন নম্বরের বদলে ওর ফোন নম্বর দিয়ে ফেলেছি। হবেও বা আমি যা ভুলোমনা। আমি চাকরি করি বাড়ি থেকে অনেক দূর একটা গঞ্জ এলাকায়, আমার স্যালারি একাউন্ট আরও দুরের একটি মফঃস্বল শহরে। সেখানে গিয়ে এসবের সুলুকসন্ধান করা আমার পোষায় না। তাছাড়া এসবে বরুণ তো কিছুটা অপমানিতও হবে। বরুণ অবশ্য বলে যাও গিয়ে বদল করে দিয়ে এসো, কিন্তু আমি জানি এতে সন্দেহের বিষ ঢুকবে ওর মনে। ফলে তোমার জন্য অতগুলো টাকা নিজের উপার্জনের ঝুলি থেকে তোলাও আমার সম্ভব নয় সোনা। দু'তিন হাজার টাকা এদিক ওদিক দিয়ে ম্যানেজ করা যায় কিন্তু তার বেশি না। না প্রহেলিকা তথাস্তুকে এসব কিচ্ছু বলল না। শুধু মৃদু স্বরে বলল, তোমার হাতটা খুব সুন্দর।

আমার কবজিটাও সুন্দর। আমার তো কোনও চাপ নেই, বউ নেই, সংসার নেই, আমার উপার্জনের টাকা আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। সদ্য এবারের জন্মদিনে আমি আমাকে একটা বড় ডায়ালের ঘড়ি উপহার দিয়েছি। মনে হচ্ছিল নিজের হাত থেকে ঘড়িটা খুলে আমি দিয়ে আসি প্রহেলিকাকে, বলি তুমি পরিয়ে দাও তথাস্তুর হাতে কিন্তু ঐ যে ভাবনা আর করতে পারার মধ্যে মানুষের থেকে যার বিস্তর ফারাক শুধু তাই নয় তথাস্তুই বা কি বলবে বাড়িতে? কে দিয়েছে তাকে অমন সুন্দর ঘড়িখানা। কাগজের মোড়ক খুলে পেপারব্যাকের *আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম* বইটি তথাস্তু প্রহেলিকার হাতে দিয়ে বলল, এটা তোমার ছেলেকে দিও।

প্রহেলিকা মৃদু হেসে বলল, বাঃ গিফট দিতে চাইলাম আমি আর উল্টে আমিই গিফট নিয়ে বাড়ি ফিরব!

তথাস্তু বলল, এটাতো তোমার নয়, এত তোমার ছেলের। তবে তোমার যখন দিতে ইচ্ছে করছে আমি নিশ্চয়ই কিছু নেবো। খুব ছোট্ট একটা কিছু আমি একদিন ঠিক চেয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।

সেটা কি বল?

বলা যাবে না । বললাম যে ঠিক চেয়ে নেব সময়মত।

লাজুক হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে প্রহেলিকা বলল, ধ্যাৎ না মেটিরিয়াল কিছু বল। তথাস্তু স্বস্নেহ প্রত্যুত্তরে বলল, হুম্ মেটিরিয়ালই তো বলব। চল এখন ফেরা যাক। পুজোকালের দিন এ অঞ্চলটা কিন্তু বেশ ফাঁকা হয়ে যায়। আজ তো আবার সঙ্গে তোমার ছেলেও নেই।

প্রহেলিকা বলল, হুঁউ চল। তবে আজ তো আমি আর সেই সদূরে ফিরব না। বললাম না আজ মামাবাড়ি এসেছি পুজোর উপহার দিতে। এই তো কাছেই শ্রাবণীতে আর ছেলে গেছে তার বাবার সঙ্গে জেঠুমণির বাড়ি ঐ পুজোর উপহার দিতেই বর্ধমানে। ফলে আজ আমি অনেকটাই মুক্ত বিহঙ্গ। তবে এর চেয়ে বেশি রাত করলে মামা বাড়িতেও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি বলে বেরিয়েছি। চল, বাব্বা আমাদের

দেশের মেয়েরা কোনও বয়সেই স্বাধীন নয়।

স্বাধীন ভাবে থাকতে চাইলে আটকাচ্ছে কে?

আমরা নিজেরাই বুঝি ঘেরা টোপে থাকতে ভালবাসি। তারও কারণ আছে, আমাদের সমাজ তো স্বাধীন মেয়েদের সম্মান দিতে শেখেনি এখনও। যাক গে, ছাড়ো পুজো ভাল কাটিও। পুজোর মধ্যে আর তো দেখা হবে না কদিন।

হতেও পারে, দেখো মাঝখানে একদিন হয়তো দুম করে চলে গেলাম তোমাদের বাড়ি।

মিথ্যা কথা বলো না, তুমি কোনওদিন যাবে না। আমি জানি।

কি করে জানলে?

ওদের খুনসুটি বাতাসে মিলিয়ে গেল। ওরা চলে গেল। কাচের ভারী দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আপনি আপনি। আমি ওদের অনুসরণ করতে পারলাম না আমার চোখ ফের আটকে গেল কোনার টেবিলে। চামেলিবালা রক্ষিত। সাদা পুঁথির ব্যাগটা কাঁধে ফেলে উঠে পড়েছে ও। সঙ্গে ওর সাগরেদ ভীমা রাও। পকেট থেকে কৌটো বার করে লবঙ্গ মুখে ফেলেছে। মটন বিরিয়ানীর উচ্ছিষ্ট আর হলুদ দলা পাকানো পেপার ন্যাপকিন পড়ে রয়েছে টেবিলে। নির্বিকার মুখে সে আমাদের মেপে নিল সকলকে তারপর হাত রাখল চামেলিবালার কাঁধের ওপরে।

আজ দেবী পক্ষের শুরু। মা প্রহেলিকা আর তথাস্তু যেন ভাল থাকে, খুশি থাকে। পুজোতে হঠাৎ করে যেন ওদের একবার দেখা হয়ে যায়। তবে আজ আমি ওদের অনুসরণ করলাম না কারণ চামেলিবালা আমায় ইশারায় ডাক দিয়েছে। আজ প্রথম আমি কোনও আলোকে অনুসরণ না করে অনুসরণ করলাম অন্ধকারকে। নিঃশব্দে আমি ঝাঁপ ফেলে দিয়ে ওদের পিছু নিলাম।

সাধারণত পিছু নেওয়া অংশটুকু আমি বাড়িতে ফিরে আমার ল্যাপটপে বসে লিখে ফেলি। কারণ কাহিনি শেষ করার দিকেই থাকে আমার ঝোঁক। কিন্তু এ কাহিনি শেষ হল না। ছায়ার মত চামেলিবালা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে গলির বাঁকে মিলিয়ে গেল। মতিঝিল স্লামের আঁকা বাঁকা গলি কিম্বা নীচু টিনের চালের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল আলেয়া কিংবা অশরীরী। সাগরেদ ভীমা রাও লবঙ্গ চিবোতে চিবোতে পাক্কা সিঁধিয়ে গেল ফ্লাইওভারের পাশে বাঁকা তেড়া চোলাইয়ের ঠেকে। মাসল বডির ওপর সাঁটিয়ে থাকা কালো হাফ হাতা গেঞ্জি খুলে বগল মুছল তারপর কোমরের সঙ্গে গুঁজে নিল হাত দুটো। বুকের ওপর কাঁকড়া বিছের ট্যাটুটা যেন খানিক কিলবিল করে নড়ে উঠল। আমি আমার আড়াই পা নিয়ে আর গাড়ি থেকে নামবার সাহস দেখালাম না। রণকে বললাম, চল। কালকে আবার আসতে হবে এখানে কিংবা ক'দিন পরে।

নয়.

প্রবুদ্ধ এসেছে। অনেকক্ষণ বসে আছে, অরণ্যা আসছে না। আগে খেলাটা উল্টো ছিল। অরণ্যা এসে বসে থাকত, প্রবুদ্ধ আসত না। না বলে কয়ে কোথায় যেন ভ্যানিস হয়ে যেত। কি করবে অরণ্যা, সে তো প্রবুদ্ধর বাড়িও চেনে না। এত বছরের সম্পর্ক তাদের তবু প্রবুদ্ধর বাড়িটা কোথায় তাও বলেনি সে অরণ্যাকে। আজ বলত সল্টলেক, কাল বলত আলীপুর, পরশু বলত রাজারহাট আর অরণ্যার মনে হত সে স্বপ্নের মধ্যে বসবাস করছে, তার সাত আটটা বাড়ি কলকাতায়। দীর্ঘ দিন ভ্যানিস থাকার পর যখন উদয় হত প্রবুদ্ধ, তখন বলত হিমালয়ের চলে গিয়েছিলাম। এটা আমার পুরনো অভ্যেস, বাবার কাছ থেকে পাওয়া, কাউকে কিছু না বলে হারিয়ে যাওয়া।

প্রথম প্রথম কেঁদে ভাসাত অরণ্যা, একদিন তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে গেছিল, আমি নিজে দেখেছি, রণকে পাঠিয়েছিলাম চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে খাড়া করতে। কেমন বিমর্ষ মুখে এসে বসে থাকত একটা চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ নিয়ে, আর চামচ দিয়ে তুলে একটু একটু করে মুখে দিত। তারপর দেখলাম অরণ্যা ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গেল। সেই কান্না, সেই আবেগ কেমন তলিয়ে গেল সমুদ্রনীল সরবতের গ্লাসে। সেক্টর ফাইভের ব্যস্ত জীবন ওকে গ্রাস করে নিল। তার জন্য দায়ী অবশ্য খানিকটা আমিও। আমি একদিন প্রবুদ্ধর পিছু নিলাম। দেখলাম অরণ্যা যখন প্রবুদ্ধর জন্য আমাদের ফুডকোর্টে আকুল হৃদয়ে অপেক্ষা করে বসে আছে, হারিয়ে যাবার অছিলায় প্রবুদ্ধ তখন অন্যত্র ব্যস্ত। একদিন আমি অরণ্যার চায়ের ট্রেতে গুঁজে দিলাম পেপার ন্যাপকিনের চিরকুট। নাউ প্রবুদ্ধ ইজ ইন আইনক্স। সিনেমা হলের অন্ধকারে সে তখন হয়তো একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে। এ সব জানা সত্ত্বেও প্রবুদ্ধর মেইল এলে অরণ্যা সব ছেড়ে আগে প্রবুদ্ধর মেইলটাই পড়ে। তবু আমার কেমন যেন মনে হয় ওদের একটা অসাধারণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত শুধু প্রবুদ্ধর অবহেলায় তা গড়ে উঠল না। এ জগতে এমনই হয়, ভালবাসার কাঙাল আমি তবু আমার ভাগ্যে কণামাত্র জুটল না, পঙ্গু শরীরটা নিয়ে আমি একটা জরদগবের মত রয়ে গেলাম আর আমারই চোখের সামনে লোভ, অহং, ইর্ষা, নীচতা, ক্রুরতা, হিংসায় কত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল। কত ছল, কত চাতুরী, কত মিথ্যা ট্রের ওপর পেঁচিয়ে রইল আটা নুডুলসের মত। তাই তো আমি শুধু এমন মানুষ খুঁজি যাদের দুজনকে আমি উষ্ণ দু কাপ কফি এগিয়ে দিয়ে মনে মনে বলতে পারি, ভাল থেকো।

টেবিল নাম্বার পাঁচ প্রবুদ্ধ আর অরণ্যা ছেড়ে দিতেই তা দখল করে নিল একটা ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। আজ এত ভিড় যে টেবিল ধরবার জন্য সবাই যেন হাপিত্যেস করে বসে আছে। ওরাও অনেকক্ষন দাঁড়িয়ে ছিল প্রবুদ্ধ আর অরণ্যার পিছনে। ধৈর্য ধরে লক্ষ্য করছিল পিৎসায় ঠিক কতখানি কামড় বসাচ্ছে অরণ্যা, কতখানি সময় নিয়ে মুখের মধ্যে খাবারকে চিবোচ্ছে প্রবুদ্ধ। প্রবুদ্ধ অরণ্যার দিকে চোখ পিট পিট করে বলল, শালা আমি কিন্তু হেব্বি খচ্চর ওরা যত বেশি তাকাবে আমি তত ধীরে ধীরে খাব।

অরণ্যা বলল, যাঃ এভাবে কোনও কথা বলা যায় নাকি, বরং এবার থেকে আমরা অন্য কোথাও যাব।

হাঁই হাঁই করে উঠল প্রবুদ্ধ। না না অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই, এটাই আমার অপিসের সবচেয়ে কাছে।

অরণ্যা বলল, এতদিন তুমি হিমালয়ে যেতে এবার আমি যাচ্ছি।

প্রবুদ্ধ বলল, ভেরি গুড, কবে?

সামনের সিক্সটিন্থ-এ। কাশ্মীর। অফিস কলিগদের সঙ্গে ট্যুর।

আগে বল নি তো?

কবে বলব? শেষ কবে তুমি আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলে?

তা মাসে দুয়েক হবে।

না এক বছর সাত মাস আগে।

যাঃ অতদিন আবার হয় নাকি?

হ্যাঁ তাই ই হয়েছে আর ঠিক এই কারণেই আমি একা থাকাটা অভ্যেস করে নিয়েছি, এমনকি তোমার ফোন নম্বারটাও আমি মুছে দিয়েছি আমার মোবাইল ফোন থেকে, ওটা স্ক্রিনের ওপর বার বার দেখলে আমার অসুবিধা হত।

তাহলে আমি যখন ফোন করলাম কি করে বুঝলে?

কারণ নাম্বারটা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

এলে কেন?

না এসে পারলাম। তাই।

বেশ ভালভাবে ঘুরে এসো।

তুমি না বললেও ভালভাবেই যাব। আমরা দুজনে রাজারহাটে একটা ফ্ল্যাট নেবো কথা ছিল মনে আছে?

হ্যাঁ শর্ত সাপেক্ষে।

হ্যাঁ যদ্দিন চাকরি যদ্দিন থাকব আমরা একসঙ্গে।

কিন্তু সিঙ্গাপুরে আমি একটা খুব ভাল অফার পাচ্ছি।

বেশ যাও। কেরিয়ারে জন্য কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে নেই। তবে দেখো বসের মেয়ের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয় সেখানে যেন আবার এমন থেকে থেকে ভ্যানিস হয়ে যেও না।

কেন নয়? মালয়েশিয়া যাবার পথে গোটা প্লেনটাই ভ্যানিস হয়ে গেল আর সেখানে তো আমি ক্ষুদ্র মানব।

জিন্সের পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে অরণ্যা এগিয়ে দিল প্রবুদ্ধর দিকে, বলল, নাও, তারপর নিজে একটা দু'আঙুলের মাঝে নিয়ে বলল, চল বাইরে যাওয়া যাক, এখানে আবার স্মোক করা যায় না, বরং করিডোরে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

সিগারেটটা ফস্ করে একবার ঠোঁটের ফাঁকে নিয়ে তারপর উল্টে পাল্টে দেখে প্রবুদ্ধ ওটা ফেরত দিয়ে দিল অরণ্যাকে বলল, রাখো এটা। আমি ক'দিন ধরে খাচ্ছি না।

ভুরু কুঁচকে তাকাল অরণ্যা, কেন?

সামান্য হেসে প্রবুদ্ধ বলল, এমনি। পড়ন্ত বিকেলের তেরচা আলোয় কেমন যেন ম্লান দেখাল প্রবুদ্ধর মুখখানি। ভয়ে আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। আমি তাড়াতাড়ি লেখা টেখা বন্ধ করে রেখে পোকেমন গো খেলায় মন দিলাম। প্রচুর পোকেমন এখানে, পোকেমন মানে সাইবার দৈত্য। তাদের ধরতে হবে আর মারতে হবে। দৈত্য মারতে মারতেই তো মানুষ একদিন স্বর্গে পৌঁছয়। কিন্তু ঐ যে এসব খেলা টেলায় আমার বেশিক্ষণ ধৈর্য থাকে না। আমার আবার চোখ চলে যাচ্ছিল ঐ টেবিলটার দিকে। সুখী পরিবার জায়গা পেয়েছে এতক্ষণে। উফ্ বাবা শান্তি। একটু জিরিয়ে নিচ্ছে ওরা চেয়ারে হেলান দিয়ে।

মা ছেলে, ছেলের বউ আর নাতি। ছোট্ট এতটুকু পিকাচু মাস ছয়েক হবে, বেবি ব্যাগে ক্যাঙ্গারুর থলির মত লেটকে আছে বাবার পেটের সঙ্গে। ছেলেটি আমার বয়সীই হবে। ওর বোধ হয় দারুণ লাগছে। ওর চোখে মুখে একটা তৃপ্তি বাচ্চাটাকে নিজের কাছে লেটকে রাখতে পেরে। অসম্ভব ভাল ছিল ছেলেটি পড়াশোনায়। ওর চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই খুব বড় ইঞ্জিনিয়র। বয়স্ক ভদ্রমহিলার চেহারায়ও আছে আভিজাত্যের ছাপ। বউটি একটি বিচিত্র জীব। সরু স্ট্র্যাপের স্যান্ডো ডোরাকাটা গেঞ্জি যা স্তন বিভাজিকা উন্মুক্ত করে নেমে এসেছে অনেকখানি, বগলের সুগভীর খাদ অত্যন্ত কুৎসিতভাবে প্রদর্শিত, বহুবর্ণ কেশরাশি অবিনস্ত পিঠ ও বুকের ওপর। টাইট জিন্স ও উগ্র মেকআপ তাকে করে তুলেছে ঐ পরিবারের কাছে এক্কেবারে বেমানান। তবু আমি খুব আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছিলাম কি অগাধ প্রশ্রয় মা আর ছেলের ঐ বউটির প্রতি। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এই সুচতুর মেয়েটি এসেছে ওদের ঠকাতে, এটা ওরা কেন বুঝতে পারছে না। আমার আশঙ্কা একটু পরেই প্রমাণিত হল।

হঠাৎ অসম্ভব ভিড় আমাদের এখানে। এক হাত দূরের লোকজনও যেন হারিয়ে ফেলছে নিজের লোকজনদের। একটা টেবিল পাবার জন্য মানুষ দাঁড়িয়ে আছে একঘণ্টা। ছেলেটি এগিয়ে দিল টাকা। বউটির হাতে দিয়ে বলল, তোমার যা খুশি কিনে আন আমরা বসছি। টাকা হাতে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল মেয়েটি। খাবারের প্রতীক্ষায় বসে রইল ছেলেটি ও তার মা। ছেলেটি পুচকিটাকে বুকের উপর থাবড়ে থাবড়ে শান্ত রাখছিল। আর অপেক্ষা করছিল। ওদের সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম আমিও। অসম্ভব ধৈর্য মা ও ছেলের কিন্তু আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল। হ্যাঁ ভিড়ের দিনে আমাদের এখানে খাবার পেতে দেরী হয় ঠিকই কিন্তু তাই বলে এত দেরীও নয়। আমি চোখ দিয়ে ইতি উতি খুঁজছিলাম সেই চিড়িয়াকে, কিন্তু কোথাও দেখতে পাচ্ছিলাম না।এবার আমি আমার সাগরেদ রণকে পাঠালাম ব্যাপারটা সরজোমিনে তদন্তে করতে এবং ফলাফলও বেরিয়ে এল দ্রুত। তিনি তখন লিফ্টের ভিতরে দাঁড়িয়ে তার পুরনো প্রেমিকের সঁঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছিলেন আর কাতুকুতু খেলছিলেন। সময়ের হিসেব ছিল না কোনও। বেচারা ছেলেটি দু'একবার ফোন করেও ধরতে পাচ্ছিল না তার বউকে। ধরবে কি করে আমাদের এখানে লিফ্টের ভেতরে যে সবসময় মোবাইলের টাওয়ার থাকে না, রনের বক্তব্য অনুযায়ী রণ নাকি লিফ্টের ভেতরে সিঁধিয়ে আর নড়ে না। ওদের পাশে সাঁটিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে বিরক্ত হয়েই খানিক সম্বিত ফিরেছে মেয়েটির এবং ফিরে এসে দ্রুত কিছুটা সময় ম্যানেজ করার জন্য আমার কর্নার থেকে তিনজনার তিনটি কচুরী আর চা নিয়ে গিয়ে গল্প দিল– সব কর্নারে এত লাইন এত দেরী করছে খাবার দিতে যে শেষ পর্যন্ত সে সমস্ত অর্ডার ক্যানসেল করে শুধু চা নিয়ে এসেছে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম আবার কি অগাধ বিশ্বাসে ভদ্রমহিলা আর তার ছেলে গরম কচুরিতে কামড় দিচ্ছেন। আর উলুক ঝুলুক তখনও ছটফট করছে, তার চোখ ঘুরছে এদিক ওদিক, আমি বুঝলাম এই ভীড়ের মধ্যেই কোথাও আছে ওর পুরনো প্রেমিক। রণ অবশ্য জানালো প্রেমিক ছেলেটি দরজা ঠেলে ঢুকতে গিয়ে রণকে দেখেই অন্তর্ধান করেছে গুটি গুটি। কি জানি রণও আবার এটা গল্প দিল নাকি। কেন না বডিবিল্ডার রূপের কাছে তার ক্যারিসমা নেহাতই সাদামাটা কিনা।

মেয়েদের স্মোক করতে দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। যদিও সিগারেট স্মোকিং ইজ ইনজুরাস টু হেলথ তাই প্রবুদ্ধর না খাওয়াই ভাল। পারলে অরণ্যাকেও আমি কখনও বকে দেবো। কিন্তু আজ ওর সামনে গিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট চাইতে ইচ্ছে হল আমার তারপর ইচ্ছে হল গোল গোল রিং বানিয়ে যেমন ভাবে ঋতুপর্ণার মুখের ওপর ছাড়তাম তেমনভাবে অরণ্যার মুখের ওপর ছাড়তে, মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল রাগলে কাকে বেশি সুন্দর দেখায় ঋতুপর্ণাকে না অরণ্যাকে। এই যে অসংখ্য চরিত্রের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হয়ে আমি বাঁচি এই বাঁচাটাই আমার পূর্ণ বাঁচা যা আমার অর্ধাংশের জীবনকে মিথ্যে করে দেয়। টেবিল নাম্বার সাত অথবা মিথ্যের ঘরবাড়ি। অধ্যায়ের নামকরণ হয়ে গেলে আমি লেখা বন্ধ করলাম। এখন আমি ঝাঁপ বন্ধ করে কোনও বার-এ গিয়ে বসব। যেখানে বুঝকি অন্ধকারে ঘন হবে রাতপরীরা। আমার ফ্যামিলি ফুডকোর্টের হৈ হৈ কফি হাউস চরিত্রের সঙ্গে যার শ্রেণিবৈষম্য যোজনখানেক। এখানে কারোর মুখ দেখা যায় না ভাল করে। তাই এদের নিয়ে আমি লিখতে পারি না। তবু এর মধ্যেই আমি একজন সাহিত্যিককে দেখেছিলাম খানিক অন্যরকম। একদিন আমার সামনে চেয়ার টেনে এনে বসেছিলেন, বলেছিলাম, মিস্টার ঘৃণা করুন মানুষের মনুষ্যত্বের পঙ্গুত্বে, নিজেকে নয়।

সাহিত্যিকেরা সবসময় অন্যরকম হয়, ওদের মনের গঠন অনেক প্রসারিত, উন্মুক্ত, সাহিত্যিক আমি আমার ফুডকোর্টেও দেখেছি, লেখিকা। কেউ খেয়াল করত না আমি দেখেছি, মাঝে মাঝে আসতেন, কোণার একটা টেবিলে বসে সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেন আর কফি, চা, বা কচুরি, খেতেন। লাইন টানা সাদা কাগজ আর কালির কলমে কি সব লিখতেন টুকটুক্ করে। অত হৈচৈ অত লোকের মধ্যে বসে কি করে লিখতেন আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, অথচ তিনি কিন্তু আমাকে গ্রাহ্যও করতেন না। সত্যি কথা বলতে কি আমি খানিক প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম ভদ্রমহিলার। বছর চল্লিশ বয়স, টানাটানা চোখ, নাকের ওপর ঝুলে থাকা কালো ফ্রেমের চশমা, হাতে সরু লেদার ব্যান্ডের ঘড়ি। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতাম ওঁর দিকে। ওঁর দিকে চা এগিয়ে দিতে গেলে আমার হাত কাঁপত। সে ছিল আমার স্বপ্নের রানি। স্বপ্নের রানির বয়স দেখতে নেই, সে আমার থেকে ছোট কি বড় ভাবতে নেই। ক্লিওপেট্রার বয়সের কথা কেউ ভাবে? অড্রে হেপ্‌বার্ন? আমি কেমন যেন অপেক্ষা করে থাকতাম সে কবে আসবে এই ভেবে। আমার ইচ্ছে করত ওঁর কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখি ও কি লিখছে। তিনি যেদিন আসতেন সেদিন রাত্রে আমি কিছু খেতে পারতাম না। দু'এক টুকরো রুটি চিবিয়ে রেখে দিতাম। আমার খিদে পেত না। মা উদ্বিগ্ন হত, উতলা হত, বার বার জিজ্ঞাসা করত আমার শরীরের কথা। শরীর শরীর তোমার মন নাই কুসুম, এই না এক লাইন লিখেই মানিক বিখ্যাত হয়ে গেলেন। অথচ মা বোঝে না, মায়ের যত কিছু চিন্তা আমার নিম্নাঙ্গ নিয়ে, পঙ্গু দু'পা আর অসাড় যৌনাঙ্গ নিয়ে। অথচ মা কেন বোঝে না আমার মস্তিষ্কের অতিমাত্রায় সক্রিয় স্নায়ু কোষ, বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে উৎপাদিত রাসায়নিক, সব, সবকিছু স্বাভাবিক। আমি এক অবোধ্য যন্ত্রণায় ছটফট করি সারাক্ষণ। আমার মনে হয়েছিল বারে সেদিন ঐ সাহিত্যিককে ডেকে বলি, হেই ইডিয়েট নভেলিস্ট স্প্লিট পার্সোনালিটির গল্প লিখে লিখে তো পাতা ভরান, ইগো, অল্টার ইগো, আমার মত শরীর আর মনের এই দ্বিখণ্ডিত সত্তায় বাঁচতে গেলে বুঝতেন, টানাপোড়েন কাকে বলে? তাই জ্ঞান দেবেন না। অথচ ভদ্রলোক যখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শ্রদ্ধায় আমার মাথাটা নত হয়ে এসেছিল। ছোট থেকে ওঁর লেখা পড়ে বড় হয়েছি, আজ আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এ কি কম কথা!

● পরবর্তী সংখ্যায়

অনিন্দিতা গোস্বামী ভারতের কথাসাহিত্যিক

অনিন্দিতা গোস্বামী

জন্ম নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। বিদ্যালয়জীবন থেকে কবিতা লেখার শুরু। ১৯৯৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন প্রথম কবিতার বই। ২০০৬ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকার* 'নবান্ন'তে গল্প প্রকাশের মাধ্যমে গদ্যসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখেছেন দেড় শতাধিক গল্প। প্রকাশিত হয়েছে একাধিক উপন্যাস। প্রাদেশিক ভাষায় অনুদিতও হয়েছে অনেক গল্প। প্রকাশিত হয়েছে গল্প সংকলন। *আনন্দ পাবলিশার্স* থেকে প্রকাশিত হয়েছে সুবৃহৎ উপন্যাস *অববাহিকা*। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বারো। বর্তমান নিবাস পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কল্যাণীতে।

বাবরু

হেঁসেলঘর

হিমাচল প্রদেশের খাবার-দাবার

মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও হিমাচল প্রদেশ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক চমৎকার সংমিশ্রণও আপনাকে উপহার দেবে। 'হিম' সংস্কৃত শব্দের মানে হচ্ছে তুষার। হিমাচলি খাবারে প্রতিবেশী পঞ্জাব ও তিব্বতের গভীর প্রভাব রয়েছে। তাদের প্রতিটি খাবারই সময় নিয়ে রান্না করতে হয়, তাতে সৌগন্ধ ও সুস্বাদ বজায় থাকে– অনেক খাবার আবার পাস্তরিত করতে হয়।

হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধরনের টাটকা সবজি তেমন পাওয়া কঠিন, তবে নানা রকম সবজিহীন খাবার, চাল, ডাল ও নানা ধরনের শিম বিচির ব্যবহার খাবারকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তোলে। হিমালয়ের এই পাদদেশে সর্বোচ্চ মানের বাসমতি চাল পাওয়া যায়। ঋতুভিত্তিক প্রাপ্ত শাকসবজি ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে দৈনন্দিন খাবার প্রস্তুত হয়। হিমাচলের নিম্নাঞ্চলে আপনি অনেক রকমের শাক-সবজি, ফল-মূল পাবেন, যত উপরের দিকে উঠবেন, সবজি অপ্রতুল হয়ে উঠবে, মাংস ও দানা শস্যের উপর নির্ভর করতে হবে।

পাহাড়ি চিকেন

মাছ ভাজা

চানা মদ্রা

ছা গোসত

হিমাচল প্রদেশের উত্তরাঞ্চল যেমন স্পিতি ও লাহুলের জলহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক, যেখানে বাজরা, বার্লি সুলভ। সেজন্য সেখানকার ঐতিহ্যবাহী খাবার সিদ্দু আখরোটি বা গুলগুলে খাদ্যশস্যভিত্তিক। দক্ষিণাঞ্চলের দিকে দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য সুলভ।

অধিকাংশ তরকারির ভিত্তি হিসেবে এখানে দইয়ের ব্যবহার হয়েই থাকে। এর সঙ্গে আছে দেশি ঘি-মাখন। খাবার মসলাদার– এলাচ, দারুচিনি, হলুদ, ধনে গুঁড়োর ব্যবহার সুপ্রচুর। দম ঐতিহ্যবাহী উৎসবের খাবার যা ব্রাহ্মণ পাচক রান্না করে থাকে। কাংড়া উপত্যকায় এসব পাচক ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়, যাদের বিয়ে, পূজা– পার্বণ, উৎসব উপলক্ষে রান্নার জন্য বিশেষভাবে ডেকে আনা হয়।

দম রান্নায় সুগন্ধি চাল, মুগডাল, শিমবিচি, ছোলা ও দই ব্যবহৃত হয়। মিঠা ভাত রান্না করা হয় ডাল-চালের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে। পাহাড়ি লোকজনের জন্য চা অপরিহার্য। চাকু চা হচ্ছে লবণাক্ত মাখন চা যা খুবই জনপ্রিয়। এর জন্য বিশেষ এক ধরনের কালো মাখন চা, দুধ, লবণ ও মাখন প্রয়োজন। স্থানীয় ডোংমো পাত্রে এ চা বানানো হয়।

মেঘবিহীন উপত্যকা ও চমৎকার পাহাড়চুড়োয় আপনি বিশুদ্ধ সুগন্ধী খাবার পাবেন, যা আপনি বাড়িতেও চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

১. বাবরু: বাবরু হচ্ছে কালো গ্রামে ভাজা বিখ্যাত উত্তর ভারতীয় কচুরির হিমাচলি সংস্করণ।

২. পাহাড়ি চিকেন: পুদিনা, ধনে, আদা ও রসুন বাটা ভালভাবে মাখিয়ে গোটা গোটা করে ভাজা। খেতে খুবই সুস্বাদু।

৩. চাম্বা ধরনের মাছ ভাজা: ছোলার বেসনে মসলা– মাখানো মাছ ডুবিয়ে মচমচে করে ভাজা।

৪. চানা মদ্রা: ছোলা ও দই দিয়ে তৈরি মদ্রা হচ্ছে জনপ্রিয় হিমাচলি তরকারি। এটা চম্বা এলাকার নিজস্ব খাবার। এটি অনেকক্ষণ ধরে রান্না করলে তবে এর পাগলকরা ঘ্রাণ ও স্বাদ পাওয়া যায়।

৫. ছা গোসত: ভেড়ার মাংসের সঙ্গে গমের ময়দা, দই এবং এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা ও আদা মিশিয়ে ছা গোসত বানানো হয়।

৬. কুলু ট্রাউট: কুলু অঞ্চলে ট্রাউট মাছের রান্নাটি খুবই জনপ্রিয়। পরিমাণমত মসলা মিশিয়ে ট্রাউট মাছটি সরিষার তেলে সুন্দর করে ভাজা হয়।

৭. গাহট কা কোরবা: স্থানীয়ভাবে গাহট দানার খুবই স্বাস্থ্যকর উপাদেয় সুপ। সঙ্গে আদা ও ধনে পাতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

৮. খাট্টা: ছোলাদানা, আমসি বা আমের গুঁড়ো ও মসলা দিয়ে বানানো জিভে জল আনা টক খাবার।

৯. অরিয়া কড্ডা: সরিষাবাটা দিয়ে রান্না মিষ্টি কুমড়ার তরকারি।

১০. আলু পালডা: সেদ্ধ আলু দই দিয়ে ভর্তা করে এক মিনিটের মধ্যে পরিবেশন করা হয়।

• অনুবাদ মানসী চৌধুরী

কুলু ট্রাউট

গাহট কা কোরবা

খাট্টা

আলু পালডা

আরিয়া কড্ডা

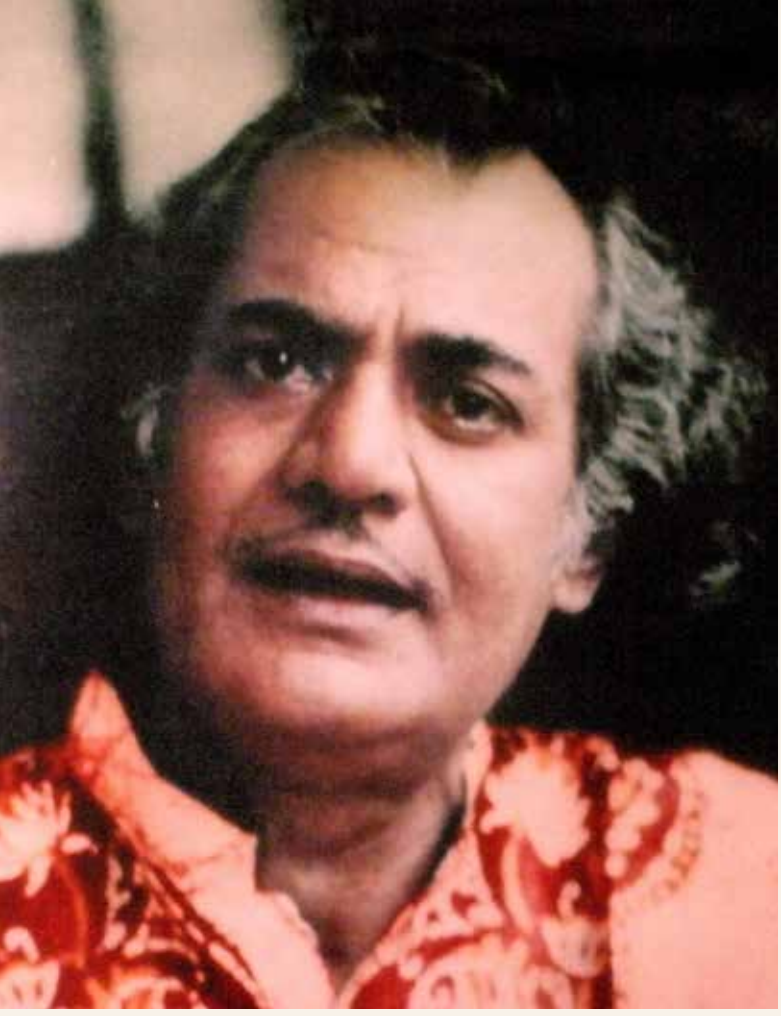

শেষ পাতা

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আজ এমন একজন গায়কের প্রসঙ্গে কলম ধরেছি, যিনি বাংলার আধুনিক গানের স্বর্ণযুগে তাঁর অনুপম কণ্ঠমাধুর্যে বাঙালি শ্রোতার মন জয় করেছিলেন। তিনি কলকাতায় ১৯৩১ সালের ১১ আগস্ট জন্মগ্রহণ এবং ১৯৯২ সালের ৯ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। পঞ্চাশের দশকের একেবারে গোড়ায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এলেন তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি এবং আলাদা এক স্টাইল নিয়ে যাঁর ভিতটা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ওপর দাঁড়িয়েছিল। মানবেন্দ্রর গায়নভঙ্গী তৎক্ষণাৎ শ্রোতার মন জয় করল। সেই সময় বাংলা আধুনিক গানের আকাশে জ্বলজ্বল করছেন কিছু অসাধারণ তারকা, যাঁদের মধ্যে ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, অখিলবন্ধু ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের মত গায়কেরা। পঞ্চাশ, ষাট বা সত্তর দশকে বাংলা আধুনিক গান উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছেছিল, সেজন্যে সময়টাকে বাংলা আধুনিক গানের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

সে-সময় বাংলার আকাশে এমন কিছু গুণী গায়কদের সমাগম ঘটেছিল, যাঁরা তাঁদের অনুপম কণ্ঠমাধুর্যে বাংলা সংগীতপ্রেমীদের মজিয়ে রেখেছিলেন। বস্তুত, তাঁদের কণ্ঠ উৎসাহিত করেছিল সেই সময়কার গীতিকার, সুরকারদের যাঁরা তাঁদের অসংখ্য স্মরণীয় সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সংগীতজগতে এক অপরূপ মূর্ছনার সৃষ্টি করেছিলেন। এই গায়কদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নিজস্ব অননুকরণীয় গায়নভঙ্গী ছিল এবং গানের কথা ও সুরসৃষ্টি তাঁদের গলার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যেত। সেই সময়কার বাংলা নন-ফিল্ম আধুনিক গান এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, যা পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা সিনেমার গানকে হার মানায়। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংগীত শিক্ষার শুরু তাঁর স্বনামধন্য দুই কাকা রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে। তাঁদের উৎসাহে মানবেন্দ্র শ্রোতাদের মন জয় করেন ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রেকর্ড 'নাই চন্দনলেখা শ্রীরাধার চোখে নাই নাই শ্যামরায়'-এর মাধ্যমে। এইচএমভি কোম্পানি তাঁর দুটি গান 'ফিরে দেখো না' ও 'জানি না তুমি কোথায়' প্রকাশ করে। গান দুটির কথা সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের– গান দুটি কীর্তন আঙ্গিকে সুর করা। সংগীতশিক্ষার প্রথমলগ্ন থেকেই তিনি কীর্তন, ভজন, ও ভক্তিগীতিতে শিক্ষিত হন।

একের পর এক গান হিট হতে লাগল। এই সময় প্রকাশিত আরও দুটি গান, 'এমনি করে পড়বে মনে' (গীতিকার শ্যামল গুপ্ত) আর রাগাশ্রয়ী 'ঘুমায়ো না সহেলি গো'। খুব শিগগিরই তিনি তখনকার বিখ্যাত সুরকারদের নজর কাড়লেন। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, অনল চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর মজুমদার, জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

তাঁর সফল গানগুলির মধ্যে

সলিল চৌধুরীর সুরে 'আমি পারিনি, বুঝিতে পারিনি' ও 'যদি জানতে' সুধীন দাশগুপ্তের সুরে 'ময়ূরকণ্ঠী রাতের নীলে' ও 'তার চুড়িতে যে রেখেছি এ মন সোনা করে'। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে 'যদি আমাকে দেখো তুমি উদাসী' ও 'সেই চোখ কোথায় তোমার', প্রবীর মজুমদারের সুরে 'এই নীল নির্জন সাগরে', হিমাংশু দত্তের সুরে 'বিরহিনী চির বিরহিনী', নচিকেতা ঘোষের সুরে 'বনে নয় মনে মোর' ও 'আহা না রয় না', সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'তোমার পথের প্রান্তে মনের মণিদীপ জ্বেলে রেখেছি' ও 'তুমি ফিরায়ে দিয়েছ বলে'।

তাঁর নিজের সুরারোপিত কিছু অনন্য গান 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি' ও 'সেই ভাল এই বসন্ত নয়', 'রিমঝিম বাজে মঞ্জিরা কার', 'না যেও না মধুযামিনী' (হংসধ্বনি রাগাশ্রয়ী) প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রথমে উল্লিখিত গানটি এক অতুলনীয় সুরসৃষ্টি। এর প্রমাণ মেলে যখন এইচএমভি তাঁর সংগীত সংকলনের মধ্যে এই গানটি রাখে এবং বেশিরভাগ রেডিও স্টেশনে এখনও এই গানটি শোনা যায়।

নজরুলগীতির জগতেও তিনি সমান উজ্জ্বল। তিনি প্রথিতযশা, প্রবাদপ্রতিম দুই শিল্পী আঙুরবালা দেবী ও ইন্দুবালা দেবীর কাছে নজরুলগীতির তালিম নেন। তাঁর গাওয়া বিখ্যাত নজরুলগীতির মধ্যে 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', 'অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারি', 'মুসাফির মোছরে আঁখিজল', 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নজরুলগীতির জগতে তিনি নিজেই ছিলেন এক প্রতিষ্ঠান।

বাংলা সিনেমা জগতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় পা রাখেন ১৯৫৪ সালে উত্তমকুমার অভিনীত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *চাঁপাডাঙার বৌ*-এর মধ্যে দিয়ে, ছবির গানগুলি স্বয়ং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন।

তাঁর অন্যান্য সুরারোপিত ছবিগুলির মধ্যে আছে *লালু ভুলু, মায়ামৃগ, নীলাচলে মহাপ্রভু, জয়জয়ন্তী, সুদূর নীহারিকা* প্রভৃতি। আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি– এ গান তো মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সিগনেচার গান, আরও মুগ্ধ হবার মত গান 'একজনমের এই ছোট এ জীবনে ভালবেসে বঁধুয়া তৃষ্ণা মেটে না, সবটুকু মন জুড়ে তুমি তো রয়েছ, স্বর্গ পেলাম কেন অমৃত মেলে না' আর 'এই গঙ্গা, এই পদ্মা'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, এঁরা ছাড়াও বাংলা সংগীত জগতে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটা আলাদা জায়গা ছিল, চিরদিন থাকবে।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

অভিনন্দন মো. নুরুল আমিন!

প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে 'ভারতকে জানুন' প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ থেকে জয়ী মো. নুরুল আমিন এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। নুরুল আমিনকে অভিনন্দন। বিশ্বজুড়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া হাজার হাজার বিদেশী নাগরিকের মধ্যে তিনি ভারত সফরের জন্য মনোনীত হয়েছেন! ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে।

চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য সুখবর

বাংলাদেশকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখে গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৫১তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশে নির্মিত এবং বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত সেরা চারটি চলচ্চিত্র– জীবনঢুলী, মেঘমল্লার, আন্ডার কনস্ট্রাকশন এবং ইতি, তোমারই ঢাকা প্রদর্শিত হয়

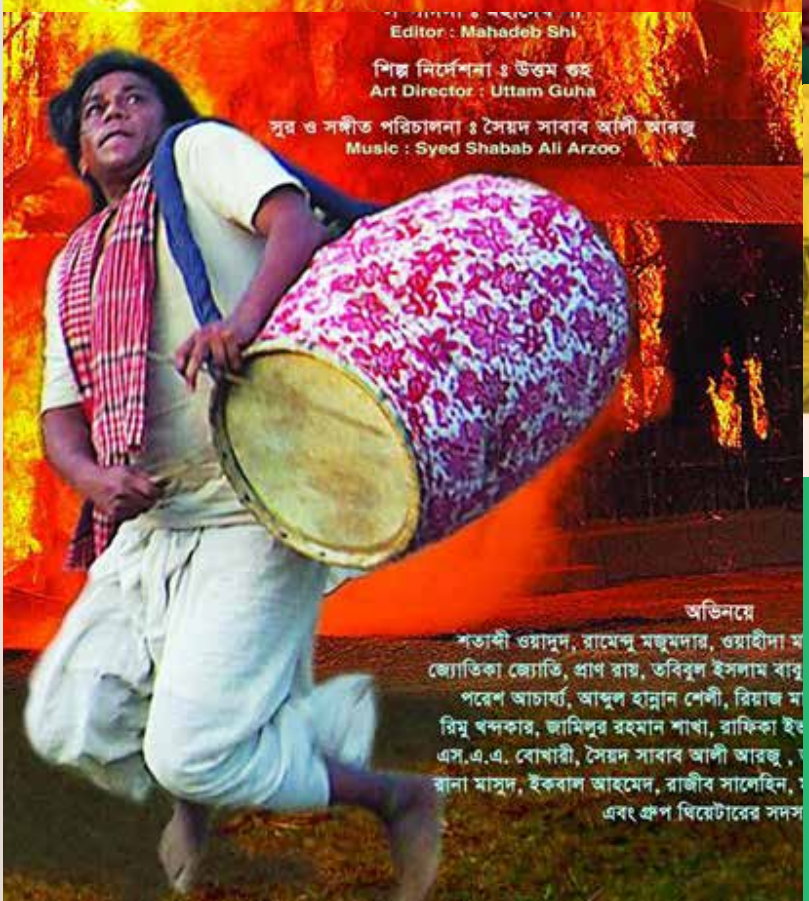

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra, January 2021

ভ্যাকসিন মৈত্রী ॥ একসাথে হারাব কোভিডকে

বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যসেবাগত চাহিদা মেটাতে দীর্ঘসময় ধরে বিশ্বস্ত অংশীদার হতে পেরে ভারত অত্যন্ত সম্মানিত। আগামীকাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে কোভিড ভ্যাকসিন সরবরাহ শুরু হবে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য দেশে ভ্যাকসিন পাঠানো হবে

ভ্যাকসিন মৈত্রী ॥ একসাথে হারাব কোভিডকে

ভারত মানবজাতির কল্যাণে ভ্যাকসিন সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে। আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে ২০ জানুয়ারি থেকে ভ্যাকসিন সরবরাহ শুরু হবে। কোভিডসৃষ্ট চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে বিশ্বের এই ফার্মাসি

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টুইটার, ইন্‌স্টাগ্রাম ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন, লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in /IndiaInBangladesh

@ihcdhaka /hcidhaka /HCIDhaka